বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE-৩০১

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE - ৩০১

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ প্রান্তিক

(১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮)

একক–১ : পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ

একক–২ : শেষ পর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

একক–৩ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা

একক–৪ : প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ পুনশ্চ

একক–৫ : পুনশ্চ—গদ্য কবিতার নিদর্শন

একক–৬ : পুনশ্চ কাব্যে রঙের ব্যবহার

একক–৭ : পুনশ্চ—নতুন কালের পদধ্বনি

একক–৮ : পুনশ্চ—অন্ত্যজ জীবনের কাহিনী

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ ফাল্গুনী

একক–৯ : 'ফাল্গুনী' সমসাময়িক রচনা ও কাহিনি

একক–১০ : 'ফাল্গুনী' নাটক ও শিল্পবিচার

একক–১১ : 'ফাল্গুনী' নাটকে গান, রূপক ও সাংকেতিকতা

একক–১২ : চরিত্র বিশ্লেষণ

পর্যায় গ্রন্থ ৪ তাসের দেশ

একক–১৩ : তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ

একক–১৪ : গীতিনৃত্যনাট্য

একক–১৫ : ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

একক–১৬ : তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE - ৩০১

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

বিশেষ পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১ প্রান্তিক	১	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ	১-১১
	২	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	শেষপর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক	১২-১৪
	৩	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা	১৫-১৮
	৪	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা	১৯-২৩
পর্যায় গ্রন্থ-২ পুনশ্চ	৫	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পুনশ্চ—গদ্য কবিতার নিদর্শন	২৪-২৮
	৬	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পুনশ্চ কাব্যে রঙের ব্যবহার	২৯-৩২
	৭	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পুনশ্চ—নতুন কালের পদধ্বনি	৩৩-৩৪
	৮	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পুনশ্চ—অন্ত্যজ জীবনের কাহিনী	৩৫-৩৭
পর্যায় গ্রন্থ-৩ ফাল্গুনী	৯	ড. তুষার পটুয়া	‘ফাল্গুনী’ সমসাময়িক রচনা ও কাহিনি	৩৮-৪৪
	১০	ড. তুষার পটুয়া	‘ফাল্গুনী’ নাটক ও শিল্পবিচার	৪৫-৫০
	১১	ড. তুষার পটুয়া	‘ফাল্গুনী’ নাটকে গান, রূপক ও সাংকেতিকতা	৫১-৫৬
	১২	ড. তুষার পটুয়া	চরিত্র বিশ্লেষণ	৫৭-৬৩
পর্যায় গ্রন্থ-৪ তাসের দেশ	১৩	অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক	তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ	৬৪-৭৩
	১৪	অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক	গীতিনৃত্যনাট্য	৭৪-৭৭
	১৫	অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক	ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান	৭৮-৮১
	১৬	অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক	তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা	৮২-৮৭

পর্যায় গ্রন্থ-১

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থ

একক-১

পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

৩০১.১.১.১ : প্রান্তিক কাব্যের কবিতাগুলির ব্যাখ্যা

৩০১.১.১.১.১ : ১-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.২ : ২-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৩ : ৩-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৪ : ৪-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৫ : ৫-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৬ : ৬-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৭ : ৭-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৮ : ৮-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.৯ : ৯-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১০ : ১০-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১১ : ১১-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১২ : ১২-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৩ : ১৩-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৪ : ১৪-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৫ : ১৫-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৬ : ১৬-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৭ : ১৭-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.১.১৮ : ১৮-সংখ্যক কবিতা

৩০১.১.১.২ : আদর্শ গ্রন্থাবলি

৩০১.১.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.১.১ : প্রান্তিক কাব্যের কবিতাগুলির ব্যাখ্যা —

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের একেবারে শেষ কবিতাদুটির সুর অন্যান্য ষোলটি কবিতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি কবিতাই লেখা হয়েছিল একই দিনে, পঁচিশে ডিসেম্বর, অর্থাৎ বড়োদিনে। প্রথমটির রচনাস্থান হিসাবে শান্তিনিকেতন এবং কাল হিসাবে ২৫.১২.৩৭ তারিখ দেওয়া আছে, দ্বিতীয়টিতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'খ্রীস্ট-জন্মদিন।' আমরা কবিতাগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা আগে করে নেব।

৩০১.১.১.১.১ : ১-সংখ্যক কবিতা —

অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ার ছন্দোরূপে লেখা এই কবিতায় কবি মৃত্যুকে যেন স্পষ্ট দেখেছেন এবং তার ফলে নিজের অনুভূতির কী পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝবার চেষ্টা করেছেন।

কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুদূত এসেছিল 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরাল' থেকে। জীবনের প্রান্তে যত ধূলি ছিল মলিনতা ছিল, ব্যথার দ্রাবক রস সব ধুয়ে দিয়েছে তা। জীবনকে নিঃশব্দে যে তা মার্জনা করে চলেছিল, কবির এ কথায় তাঁর 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধটির কথা আমাদের মনে পড়ে। কবির এই রোগতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হযেছে যেন বিধাতার নব নাট্যভূমিতে এক নতুন নাটক অভিনয়ের জন্য যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে। বিপুল অন্ধকারে জেগে উঠেছে এক আলোর তর্জনী। অসীম তন্দ্রাকে বিদীর্ণ করে

আলোকের এক শিহরণ চমকিত করে দিয়েছে কবিকে—যেন শূন্য অন্ধকারের গূঢ় নাড়িতে জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

এই আকস্মিকতা এবং বিভ্রম কেটে যেন সত্য দর্শন হয়েছে এবার কবির। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর মধ্যে নতুন এক শুভ্র চৈতন্যের জন্ম হয়েছে। অতীতের যে দেহ এতদিন তিনি বহন করে নিয়ে চলেছিলেন তা যেন 'ত্রস্ত হয়ে পড়ে/দিগন্ত-বিচ্যুত।' এই দেহ থেকে মুক্তিলাভ করে কবি যেন মুক্তি পেয়েছেন অন্তরাকাশে, 'সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে' যে 'অলোক আলোকতীর্থ' সেখানেই যেন উপনীত হযেছেন তিনি।

অর্থাৎ এই কবিতায় আসন্ন মৃত্যুর জন্য কোনো দুঃখ নেই, কবি কল্পনা করে নিয়েছেন এবার এক নতুন জীবননাট্য শুরু হবে, এই আলোকিত উদ্ভাসন তারই সংকেত।

৩০১.১.১.১.২ : ২-সংখ্যক কবিতা —

আটপংক্তির ছোট এই ২-সংখ্যক কবিতাটিও অন্ত্যমিলবর্জিত একটি মহাপয়ার। প্রথম কবিতার অনুভূতিই এখানে সঞ্চারিত হয়েছে প্রায় অভিন্নভাবে। মৃত্যুক অতি প্রসন্নচিত্তে যাতে গ্রহণ করতে পারেন সেই জন্যই তাকে 'আলোকের দান' হিসাবে দেখেছেন। এই আলোকের দানে এ জীবনের যত আবর্জনা রাশি —'আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি', 'ক্ষুধিত অহমিকার/উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত' সব জঞ্জাল দগ্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কবি বিশ্বাস করেন নতুন এক সূর্যোদয় আসন্ন—পূর্ব সমুদ্রের পারে আছে এক অপূর্ব উদয়াচলচূড়া, এক অমর্ত্য প্রভাতের অরুণকিরণে মিলে যাবে এই মর্ত্যের প্রান্তপথ।

বোঝা যায়, মৃত্যুকে অদূরে ছায়া বিস্তার করতে দেখে কবি মনে মনে সান্ত্বনার আলোক খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন।

৩০১.১.১.১.৩ : ৩-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ৩-সংখ্যক কবিতাটি মহাপয়ারে রচিত অন্ত্যমিলহীন একটি সনেট। সমগ্র কবিতার মধ্যে অবশ্য কোনোরকম বিভাজন নেই, ভাবের কোনো পরিবর্তনও নেই—একই ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে সমস্ত কবিতায়।

সামগ্রিকভাবে দেখলে একেও কবির মনের সান্ত্বনামূলক কবিতাই বলতে হবে, কারণ এখানেও মৃত্যুর পর এখন এক স্থানে উপনীত হবার স্বপ্ন কবি দেখেছেন যেখানে বিশ্বস্রষ্টার পাশে তাঁর নিজের আসন পাতা থাকবে। এই জন্মের সঙ্গে কবির 'স্বপ্নের জটিল সূত্র' ছিঁড়ে গিয়েছে, এটা কবি অনুভব করেছেন। কিন্তু এরপর কী! কবির মনে হয়েছে, এবার সামনে যে পথ, তা চলে গিয়েছে

'অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে।' কিন্তু সেখানে রয়েছেন 'মহা-এক' — অবশ্যই তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, কবি নিজেও এখন একাকী বলে তাঁর মনে হয়েছে সেই মহা-এক যেন এখন ডাক পাঠিয়েছেন এই একাকীকে। এবার সেই একাকী-নিঃষঙ্গতার পথে যাবার জন্য পৃথিবীতে বহু সঙ্গলব্ধ কবি যেভাবে তার নিন্দা করে নিঃসঙ্গতার প্রশংসা হয়েছেন তাতেই বোঝা যায় কবি কৃত্রিমভাবে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চাইছেন, তা নাহলে বলতেন না—

'জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষু র ইঙ্গিতে।'

যাই হোক, এর পর বিশ্বসৃষ্টিকর্তা যখন কবিকে ডাক দিয়েছেন তাঁর পাশে আসন করে নিতে, তখন কবি 'ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা' পেছনে ফেলে সেখানে নতুন জীবনছবি আঁকবার জন্যে এগিয়ে যাবেন, এমন কথাই বলেছেন।

৩০১.১.১.১.৪ : ৪-সংখ্যক কবিতা —

৪-সংখ্যক এই কবিতাটি প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ারে লেখা এই কবিতার শেষেও মৃত্যুর পরপারে 'শুকতারা-নিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে-'র কথা আছে, কিন্তু এখানে একেবারে আন্তরিক একটি অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিমভাবে। সেই কারণেই এর একটি বিশেষ মূল্য আছে।

কবি এই কবিতায় বলেছেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন দেবতার আপন স্বাক্ষর তাঁর হৃদয়ে আঁকা আছে। তিনি সত্য অনুভব করতে পারেন এবং তা প্রকাশেও ক্ষমতাও তাঁর আছে। সেই অনুভূতি থেকেই সারাজীবন তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন প্রচুর কবিতা, কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে বুঝতে পারছেন দেবতার সেই আশীর্বাদ আজ মিলিয়ে গিয়েছে, কবির কাব্য 'আজ

পণ্যসামগ্রী - প্রচুর পাঠক এবং সমালোচক নানারকম ভাবে তার যে মূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই মূল্যেই তাঁর আদি উপলব্দির সত্য আজ বিক্রীত পণ্যের ধুলোয় ভূলুণ্ঠিত। কবি তাঁর এই মৃত্যু-পরোয়ানাকে আশীর্বাদ মনে করেছেন এই কারণে যে, এই ধাক্কা খেয়েই তিনি আজ এ সত্য উপলব্দি করেছেন যে দেবতার আশীর্বাদকে তিনি সারা জীবন ধরে শুধু পণ্যসামগ্রী করে তুলেছেন। মৃত্যুর পরোয়ানা যেন সিন্ধুপারে বেজে ওঠা আরতিশঙ্খের ধ্বনি—কবিকে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল এই সব বেচাকেনা,

আশা-প্রত্যাশার কোলাহল কত কুৎসিত। পরের মুখেই তাঁর রচনার স্বাদ গৃহীত হয়েছে এতদিন, পরের মুখই তার মূল্য নির্ধারণ করেছে। সেই দীনতা থেকে কবি আজ মুক্ত। এখন 'একাকীর একতারা' হাতে কবি প্রবেশ করবেন সেই সংগীতমন্দিরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যা তিনি পেয়েছিলেন। কবির আনন্দ সেইখানেই—

'আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।'

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমার এই ঝর্ণাতলার নির্জনে'। কবি আবার সেই খান থেকে শুরু করবেন, এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। জীবনটাকে পণ্য করে তুলেছিলেন, এবার আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুয়ে জীবনকে আবার নতুন করে শুরু করতে পারবেন, বিশ্বাসের এই জোরে কবিতাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

৩০১.১.১.১.৫ : ৫-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ৫-সংখ্যক কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ার রীতির একটি সনেট। কবি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং সেই প্রস্তুতির পথে বাধা হিসাবে কারা উপস্থিত, সে বিসয়ে আন্তরিক অনুভূতি এই কবিতায় উন্মোচিত করেছেন।

কবি মনে করেন মৃত্যু মান চির পথিকের ভারমুক্তি—'বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।' কিন্তু কবিকে সেভাবে ভারমুক্ত হতে দিচ্ছেনা তাঁর অতীত। মৃত্যু যখন কবির সামনে মেঘমুক্ত শরতের আকাশ উন্মুক্ত করতে চায় তখন পেছন থেকে ছুটে আসে জীবনের সমস্ত অকৃতার্থতা আর অতৃপ্ত তৃষ্ণা। অনেক কিছু করার বাসনা ছিল মনে, করা হয়ে ওঠেনি, ছায়ামূর্তি এবং প্রেতমূর্তির মতো তারা এখন সঙ্গ নিয়েছে কবির। একদিন কবি যত পেরেছেন কবিতার ফুল ফুটিয়েছেন, আজ 'পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে' 'বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ' অর্থাৎ অতৃপ্ত আশার কথা বারা বার মনে ফিরে আসাকে তিনি প্রশান্ত মৃত্যুর পথে প্রবল বাধা বলেই মনে করেছেন। কবি তাই এই অতীত, এই 'পশ্চাতের সহচর'-কে মিনতি করেছেন এই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য, কারণ তা তাঁর মরণের অধিকার হরণ করে রেখেছে। কবির আকুল প্রার্থনা :

'বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।'

৩০১.১.১.১.৬ : ৬-সংখ্যক কবিতা —

৬-সংখ্যক দীর্ঘ কবিতাটিও মহাপয়ার রীতিতে রচিত এবং এখানেও কবি কোনো অন্ত্যমিল দেননি। কবিতাটি ভাবের দিক থেকে স্পষ্টই দু-ভাগে বিভক্ত, কবিতার আঙ্গিকেও এই বিভাগ দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভাবগত ভাগ এতই পরস্পরবিরোধী যে সন্দেহ হয় এটি একই কবিতার দুটি অংশ কিনা।

কবিতার প্রথমভাগে মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কবি। অতীতের অসম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করে, যে রিক্ততা বা নিঃস্বতায় জীবন পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, তার কথা এই মৃত্যুর মহামহিম মুহূর্তে স্মরণ করার অর্থ

জগৎলক্ষ্মীর অসম্মান। কারণ মৃত্যু মানে হচ্ছে মুক্তি, মৃত্যু মানে 'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে।' মৃত্যু এক ছেদ নয়, সে এক মহাপরিপূর্ণতা, এবং কবি বিদায়ের আসন্ন মুহূর্তে প্রকৃতিতে সেই পূর্ণতার ছবিই দেখতে পাচ্ছেন। যেসব বনস্পতি দেখতে পাচ্ছেন সামনে, ব্যগ্র শাখা ঊর্ধ্বে তুলে 'মহা অলক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে, তার পল্লবে পল্লবে কম্পমান আনন্দ কবিও অনুভব করতে পারছেন। সেই পূর্ণতার আনন্দই পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কলকাকলিতে মুখর। এতদিন জীবনে যত আবর্জনা কবি জমিয়ে তুলেছেন, এতদিন যত সফল বাণী তিনি রচনা করতে পেরেছেন — গৈরিক বসনের এক সন্ন্যাষী সব গ্রহণ করবার জন্য দ্যুলোক -ভূলোক জুড়ে এক কমণ্ডলু প্রসারিত করে দিয়েছে। কবি তা বুঝতে পারছেন এবং তাঁর বর নিজের অন্তরে পেয়েছেন বলেই অন্তর আজ পূর্ণ সেই অনুভবের আনন্দে। তাঁর বিদায়ের প্রাক্-মুহূর্তেও তাই তিনি পুলকিত এই প্রকৃতির আনন্দিত পূর্ণতার ছবিতে। দলে দলে আজ প্রজাপতি তার পাখা কাঁপিয়ে শেফালির কানে কানে নীরব আকাশবাণী শোনাচ্ছে, তার বীজন কবির শিরায় শিরায় তুলছে শিহরণ অর্থাৎ জীবনের ধন সব সমর্পণ করে কবি মৃত্যুর পূর্ণতার তারে মনপ্রাণ বেঁধে নিয়েছেন।

কবিতার পরবর্তী স্তবকেই কবির কণ্ঠে রীতিমতো হতাশা সুর। যে মৃত্যুকে তিনি এত মহান ভাবে দেখিয়েছেন, এখানে তাকেই বলছেন 'সর্বহর' অথাৎ সর্বস্ব হরণকারী, যাকে আলোকের উৎসব বলে এসেছেন বার বার, তাকে এখন বলছেন অন্ধকার এবং যার আনন্দিত আবির্ভাব তাঁকে পুলকিত করেছে, তাকে এখানে বলেছেন 'দস্যুবৃত্তি'। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি আকুল মিনতি করে বলেছেন—

'পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।'

এখন তিনি প্রার্থনা করেন 'দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে' সমস্ত আহুতি দেবার আগে যেন 'জীবনের শেষপাত্র' সে উজ্জ্বসিত করে দেয়। প্রবল অন্ধকারকে সম্বোধন করে কবি বলছেন 'চরম আলোর/অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির'— যেন দান করে যায় কবিকে।

৩০১.১.১.১.৭ : ৭-সংখ্যক কবিতা —

৬-সংখ্যক কবিতার প্রতিক্রিয়াতেই যেন ৭-সংখ্যক কবিতাটি রচিত, অন্তত তার শেষাংশ কবিকে যে বিব্রত করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি। এই দীর্ঘ কবিতাটিও মিলহীন মহাপয়ার। দৃশ্যত দুটি ভাগ আছে—প্রথম তিনটি পংক্তির বিভাগে আগেকার বক্তব্যকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘ অংশে এতক্ষণ পর্যন্ত যে সুরে কথা বলেছেন, তার সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরে গেয়েছেন জীবনের জয়গান। আসন্ন মৃত্যু নয়, সমস্ত জীবনই এখন তাঁর কাছে মূল্যবান।

প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন, 'বিকারের রোগীর' মতো কীসব 'অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ' তিনি বকে গিয়েছেন! অর্থাৎ

ভিক্ষুকের মতো তাঁকে বর্জন না করার কথা, জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিত করে দেবার ভিক্ষা তাঁর অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হয়েছে। সেই জন্যেই কবিতার পরবর্তী দীর্ঘ স্তবকে তিনি বলেছেন, সমস্ত জীবনে যা তিনি পেয়েছেন তা তাঁর গৌরব, তাঁর ঐশ্বর্য—এই জীবনের দানেই তিনি পূর্ণ। এখন মৃত্যুর সন্মুখীন হতে তাঁর কোনো ভয় নেই, কারণ তিনি জেনেছেন জীবন আরো বড়ো। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাঁর কাছে এখন বরণীয় মনে হচ্ছে। নিজের আনন্দ, নিজের দুঃখ সব তাঁর সম্পদ। আনন্দও যেমন উপভোগ করেছেন, দুঃখও উপভোগ

করেছেন। বুকের রক্ত দিয়ে এঁকেছেন মানসী অনুভূতির ছবি কতদিন হয়ে গেল, তবু স্বপ্নের মতো নিজের হৃদয়ে তার

সূক্ষ্মরেখ স্পর্শ এখনো অঙ্কিত আছে। মহাকালের বুক থেকে কবি কুড়িয়ে নিয়েছেন কত অব্যক্ত মাধুরী, মনে বাতাস তারা সুরভিত করে তুলেছে। একেবারে কৈশোরে সরস্বতীর যে বরমাল্য রচনা করেছেন, কবি জানেন তা সার্থক হয়নি, বাণীদেবীর কণ্ঠভূসণ হয়ে উঠবার যোগ্যতা তা অর্জন করেনি। সেই অস্ফুট কলিকাও কিন্তু মূল্যহীন নয়। সমস্ত জীবন দিয়ে কবি রচনা করেছেন পুষ্প মুকুট। সেখানে অযাচিত প্রেমের অমৃতরস আছে, বহু সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ হয়নি এমন ব্যর্থ প্রয়াস আছে। জীবনের প্রতি পর্বে বাহিত হয়ে এইভাবে অপরূপ অনির্বচনীয়কে তিনি বচনের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। কিছু পেরেছেন, কিছু পারেন নি। কিন্তু 'জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা', কবি বলেন—

'আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।'

তাই জীবনের দেবতার জয়গানই কবি গেয়েছেন এই কবিতায়, তাঁকে 'অস্তিত্বের সারথি' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, জীবনের রণক্ষেত্র যেমন বহুবার তিনি কবিকে পার করিয়েছেন, মৃত্যুর সংগ্রামশেসে নতুন যাত্রায় নিয়ে যেতেও যেন তেমনি ভাবেই সাহায্য করেন তিনি তাঁকে।

৩০১.১.১.১.৮ : ৮-সংখ্যক কবিতা —

৮-সংখ্যক ছোট এই কবিতা একই ছন্দরূপে অন্তমিল বর্জন করে লেখা এখানে কবির বক্তব্য একমুখী। এ জন্মে কবি তাঁর যে পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন তিল তিল করে, এখন মৃত্যুর শাসনে তা সমস্তই অবলুপ্ত হতে চলেছে, তিনি বুঝতে পারছেন। রঙ্গমঞ্চে একে একে সব দীপ নিবে গেল যেমন সভাতল শান্ত হয়ে আসে, কবির চিত্তও যেন তেমনি নিঃশব্দের তর্জনী-সংকেতে শান্ত হয়ে এসেছে। একটা বিশেষ নাটকে অভিনয় করবার জন্য এক বিশেষ চরিত্রের রূপসজ্জা নিয়ে যেন তিনি সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন, আজ এই মুহূর্তে যেন তা নিরর্থক মনে হচ্ছে। কবিকে ঘিরে এতদিন কত রকমের তকমা, কত রকমের মতবাদ, কতরকম ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, আজ সমস্তই মুছে গেল। কবি মনে করেছেন তাঁর নিগূঢ় পূর্ণতার কাছেই তাঁর খণ্ডিত পরিচয় আত্মসমর্পণ করল। 'সূর্যাস্তের অন্তিম সৎকারে' বাধামুক্ত আকাশে তারাদীপ্ত আত্মপচিয় যেন ঘটেছে কবির।

৩০১.১.১.১.৯ : ৯-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের এই ৯-সংখ্যক কবিতাটি কবির আরোগ্যলাভের পরে লেখা। প্রায় আড়াই-তিন মাস পরে লেখা বলে কবির উপলব্দি অনেক সংহত ও শান্ত ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার আঙ্গিক অবশ্য অভিন্ন আছে—অন্ত্যমিলবর্জিত মহাপয়ার।

কবি এই কবিতায় যেন এক নির্মোহ বস্তুবাদী দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেয়েছেন, যদিও শেষপর্যন্ত সেই দৃষ্টি বজায় থাকেনি, কবি তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে ফিরে এসেছেন। কবি যেন দেখতে পাচ্ছেন, জীবনীশক্তির অপরাহ্ন বেলায় অবসন্ন চেতনা নিয়ে ভেসে চলেছেন তিনি কালিন্দীর স্রোতে। ভেসে চলেছে কবির এতদিনের অনুভূতিপুঞ্জ, এতদিনের বেদনা, আজন্মকালের স্মৃতির সঞ্চয়, আর তাঁর বাঁশি। বাঁশি কবির কাছে এক অতি পরিচয় প্রতীক, কারণ তাঁর গোপন কথা শুধু বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে। কালিন্দীর স্রোত তার

কালো জলে সব কিছু ণেকে নিতে পারে। সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে কবি পেরিয়ে আসেন তাঁর পরিচিত ভূমি, তরুচ্ছায়া-অলিঙ্গিত লোকালয়। সন্ধ্যা-আরতির শব্দ এখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হয়ে এসেছে। নেমে আসে অন্ধকার, এক মহানিঃশব্দের কাছে কবির আত্মবলিদান সারা হয়। এক 'কৃষ্ণ অরূপতা' দেখা দেয় এবং অন্তহীন তামিস্রায় কবির দেহ বিন্দু হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

নিজের এই নিশ্চিহ্নতা কবি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন, তাও তিনি মৃত্যুকে মহত্ত্বহীন বলতে পারেন নি। যে সূর্য তাঁর জীবনদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, এবার তাঁরই উদ্দেশে তিনি বলেছেন, তিনি তাঁর রশ্মি সংবরণ করে নিয়েছেন, এবার মৃত্যর অন্ধকারের মধ্যে যেন তিনি প্রকাশ করেন—তাঁর সেই কল্যাণময় রূপ যাতে প্রত্যক্ষ করা যায় সেই পুরুষকে, যিনি সূর্য এবং কবির সঙ্গে অভিন্ন, দুয়ের একাত্ম রূপ।

৩০১.১.১.১.১০ : ১০-সংখ্যক কবিতা—

১০-সংখ্যক এই কবিতায় কবির বক্তব্য সামান্যই। জীবনের অন্য খেলায় কবি যখন মেতেছিলেন, অকস্মাৎ এসেছিল মৃত্যুদূত, প্রস্তুত ছিলেন না কবি, তাই মৃত্যুর মহিমাময় রূপ অনুভব করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি সন্ত্রস্থ হয়েছেন, শঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু কবি কথা দিয়েছেন, এবার তিনি প্রস্তুত, মৃত্যুকে তার স্বমহিমাময় বরণ করে নেবার মতো মানসিকতা এখন তিনি অর্জন করেছেন।

এই প্রস্তুতি ছিলনা বলেই মৃত্যুকে পুরোপুরি অন্ধকারের আগ্রাসন বলে কবির মনে হয়েছিল। মৃত্যুর মধ্যেও যে আলোক সঞ্চিত আছে, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে যা প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তা কবি বুঝতে পারেন নি। কারণ, কবির অহংবোধ তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। মৃত্যুর আলোকিত সত্তা বোঝাবার কোনো অবকাশই কবির ছিল না, কারণ আমি-ময় কবি তখন জীবনের

রঙ্গভূমিতে চরম কবিত্বের শিরোপা নেবেন বলেই উন্মুক্ত ছিলেন। সেই জন্যই মৃত্যু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার সত্তায় নিয়ে যাবার মতো অবস্থায় কবি ছিলেন না। কিন্তু এখন কবি প্রস্তুত, তাই তিনি বলেছেন—

'চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।'

৩০১.১.১.১.১১ : ১১-সংখ্যক কবিতা —

১১-সংখ্যক কবিতাও কবি নিজের জীবননাট্যের কলমুখর পর্ব এবার শেষ করে শান্ত মনে পরমশান্তের ধ্যান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেছেন, জনতার চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সারাজীবন নানাভাবে তো জনতাদেবীর পূজা করেছেন, তাই খ্যাতির প্রাঙ্গণে তাঁর আসনও হয়ে গিয়েছিল পাকা। কিন্তু বচনের অর্ঘ্য রচনা করে সেই খ্যাতি অর্জন তো অনেক হল, এবার তো জীবননাট্য শেষ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত যে হতেই হবে, তার ইশারা কবি পেয়ে গিয়েছেন। ভৈরবের স্পর্শ তিনি পেয়েছেন, অন্তরের অন্দরমহলে এখন তিনি অনুভব করেন সে আর-এক ঐশ্বর্যের জগৎ। সেই জগতের ইশারায় সাড়া দেবার জন্য কবি এখন প্রস্তুত। এ জীবনে যত বিচ্ছিন্ন ভাবনা এসেছিল, স্রোতের শ্যাওলার মতো যারা চেতনার হাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কবি যাদের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তাদের কথা যদি লোকে ভুলেই যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী! এ জন্যেও কবি প্রস্তুত, তাই তিনি বলেছেন—

'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যে অস্পষ্ট বিস্মৃতি।'

৩০১.১.১.১.১২ :১২-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যের একটি অসাধারণ কবিতা এই ১২-সংখ্যক মহাপয়ার। বক্তব্য হয়ত এর আগের কবিতাগুলিতেও কিছু কিছু আভাসিত হয়েছে, কিন্তু এত সহজ সরল অথচ গভীরভাবে, এমন নিবিড় স্পষ্টতার তাঁর মনোভাব সম্ভবত আগে প্রকাশ পায়নি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এবার শেষের অবগাহন সাঙ্গ করতে বলছেন কবি মনকে। সারাজীবন কাব্যসাধনায় মূল্য পেয়েছেন অনেক, কিন্তু সে মূল্য বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে বারণ করেছেন নিজেকে, কারণ সে বাইরে থেকে দেওয়া দান, অন্তরে তাকে টেনে নিতে গেলে বিপত্তি ঘটে। বাইরের মূল্য যে স্বর্ণমুদ্রায় দেওয়া হয়, বার বার ব্যবহারে তার ক্ষয় হয়, শেষে সোনার কলঙ্করেখাই সম্বল হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থেকে, উপলব্ধি থেকে যা লিখেছেন এতদিন, তা বনের ফলের মতোই মাটিতে পড়ুক এবং মাটিতে মিশে যাক — এর বেশি তাকে নিয়ে ভাববার আর দরকার নেই।

একথা আজ স্পষ্ট যে কুসুমের মাস শেষ হয়ে গিয়েছে, ফুল ফোটাবার সময় আর এখন নেই কবির; কিন্তু সেই সঙ্গে যেন শেষ হয়ে যায় লোকের মুখে চাটুকারিতা শোনা আর তাই শুনে মনে মনে আন্দোলিত হওয়ার বাসনা। যা এতদিন দান করা হয়েছে তার জন্য এখনো পুরস্কারের প্রত্যাশা যেন না থাকে। কিন্তু সত্য অনুভব হৃদয়ে ছিল, তা কবি প্রকাশ করেছেন সারা জীবন ধরে। এখন প্রত্যেকটি কাজের মূল্য আশা করলে সেই সত্য অনুভবেরই অপমান ঘটবে। সব কিছুই ত্যাগ করতে হয়, আর শেষ ত্যাগ হবে শংসা কুড়োবার সেই ভিক্ষাঝুলি। এখন আর নতুন করে সম্মানের প্রত্যাশা করতে কবি বারণ করেছেন নিজেকেই, এখন অপেক্ষা করতে হবে এক নবজীবনের, কবি মনে করেন নবপ্রভাবের অরুণজ্যোতির তিলক নিয়ে তা অপেক্ষা করে আছে।

৩০১.১.১.১.১৩ : ১৩-সংখ্যক কবিতা—

স্বল্পায়তন ১৩-সংখ্যক কবিতায় কবি একটি নতুন কথা বলেছেন। নতুন অর্থ তিনি কখনো এমন কথা বলেননি, এমন নয়; প্রান্তিক কাব্যে এ কথা কবির মুখে আমরা প্রথমে শুনলাম। কবি বলছেন, তিনি অনন্ত কালের এক যাত্রী। এবারের

যাত্রালগ্নের শুরুতেই এক পরম আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সূর্যসনাথ এই পৃথিবীতে রূপের জগতের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া বাধা হয়ে গিয়েছিল। ভূলোকের কবি হয়েও দূর আকাশের ছায়াপথের আলোকে তিনি ধরণীর শ্যামল ললাটে চুম্বন করতে দেখেছেন, ভূলোক-দ্যুলোক এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল তাঁর কবিতায়। জন্মের সেই পূণ্য মুহূর্তকে সম্মানিত করেছিল 'মহাকালযাত্রী মহাবাণী', কিন্তু যাত্রা তো কবির শেষ হয়নি—সামনে এখন যাত্রাপথ অনন্ত এবং এ এক অদ্ভুত যাত্রা, এক মহাবিস্ময়, যে সেখানে কবির সঙ্গে কেউ নেই, সেখানে তিনি একাই যাত্রী।

৩০১.১.১.১.১৪ : ১৪-সংখ্যক কবিতা—

সম্ভবত এই ১৪-সংখ্যক কবিতা প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতায় কবি অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। মহাপয়ার রীতিতে লেখা এই সনেট এমন শান্ত স্নিগ্ধ একটি প্রণতি কবির জীবনদেবতার প্রতি এই প্রণামের গাঢ়ত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। সংস্কৃত আলংকারিকরা যে শান্তরসের কথা বলেছেন, এই কবিতার সিদ্ধিও সেই শান্তরস।

কবি বুঝেছেন এবার তাঁর বিদায় নেবার সময় হয়েছে। মন অশান্ত থাকলে দু-ভাবে এর প্রকাশ হতে পারে—মর্ত্যজীবনের প্রতি প্রবল প্রীতিতে কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে, অথবা মৃত্যুর মহিমাময় রূপ কল্পনা করে তাতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার আধ্যাত্মিক বিহ্বলতা থাকতে পারে। এই দুটি ব্যাপারই তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু ওয়র্ডসওয়ার্থ যে

Emotions recollected in tranquility-র কথা বলেছেন, এখানে সেই tranquil বা পরম প্রশান্ত চিত্তটিকে আমরা আবিষ্কার করি। এখানে মর্ত্য-জীবনের প্রতি পরম প্রীতিই আছে, কিন্তু বিহ্বলতা নেই; যেতে হবেই এ কথা কবি জানেন,তার জন্য অনুরাগ বা বীতরাগ কোনোটাই নেই।

কবি শুরুই করেছেন এই বলে, 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের।' তিনি ভবিস্যতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট এবং ওই বিহঙ্গের রূপকেই তা বলেছেন—পাখির বাসা হবে শূন্য, যত হাসিগান সেখানে ছিল, ধূলায় পড়ে অরণ্যের আন্দোলনে মিশে যাবে। ঝরে পড়া শুকনো পাতা আর ফুলের সঙ্গেই কবি উড়ে চলে যাবেন অস্তসিন্ধুপারে। যাবেন তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই জীবনের মধুর ও বেদনার মুহূর্তগুলি কি তিনি ভুলতে পারেন! এই বসুন্ধরার এত দিনের নিবিড় আতিথ্য কি ভোলা যায়। কখনো আম্রমুকুলের গন্ধে ফাল্গুনের বাতাস বিভোর করেছে তাঁকে, কখনো অশোকের মঞ্জরী তাঁরই কাছে চেয়েছে প্রীতিরসের স্পর্শ, কবি তাও দিয়েছেন। বেদনাও সহ্য করতে হয়েছে অনেক, বাস্তব পৃথিবীতে বাস করতে গেলে তা মেনে নিতেই হবে। এই সব নিয়েই প্রাণের সম্মানে কবি ধন্য। তাই এপারের যাত্রা যে মুহূর্তে সত্যিই থেমে যাবে, পেছন ফিরে শুধু একটা নম্র নমস্কার জানিয়ে যাবেন তিনি, বলেছেন, 'বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।'

৩০১.১.১.১.১৫ : ১৫-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিকের এই ১৫-সংখ্যক কবিতা বেশ কয়েক বছর আগের লেখা। অন্ত্যমিলযুক্ত মহাপয়ার রূপকৃতিতে রচিত এই কবিতায় কিন্তু মৃত্যুকে রোমান্টিক দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে। প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের কবিতা হিসাবে এর অন্তর্ভুক্তির কারণ দুটি—প্রথমত এটি মৃত্যুচিন্তা প্রকাশক কবিতা, দ্বিতীয়ত কবি নিজেকে এই স্থান কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজের অস্তিত্বকেও নিজের পর্যবেক্ষণের বিষয় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন।

কবি প্রথমেই ঘনমেঘে ঢাকা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বর্ণনা দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন, বলেছেন সূর্যের দ্বারা রুদ্ধ করেছিল দৈত্যের মতো পুঞ্জ মেঘভার। যে সময় আলোক-উদ্ভাস দেখার কথা সে সময় এই ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ দেশে, আলোকের এই ম্লান অসম্মান দেখে সমস্ত দিগন্ত ছিল অশ্রুবাষ্পে আকুল। নীচে গাছের একটি পাতাও যে কাঁপেনা, সে যেন প্রকৃতির স্তব্ধ আঁখির পাতা।

অকস্মাৎ কী যে একটা হয়ে যায় কবি বুঝতে পারেন না, কোথায় যেন বেজে ওঠে জয়শঙ্খ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গগনপ্রাঙ্গণে হেসে ওঠে শরৎ। মেঘজাল ছিন্ন করে জ্যোতিষ্কণা বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দিকে। যেন মনে হয় এ পুরনো পৃথিবী নয়, এক নবীন পৃথিবীর জন্ম হল যেন এই মাত্র। নিজেকেও কবি এই পৃথিবীতে নবীন আগন্তুক হিসাবেই ভাবেন। ভাবীকালের এক তীর্থযাত্রী যেন তিনি, কালের স্রোতে এসে পড়েছেন এখানে। এ এক আশ্চর্য দেখা —

'আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন
অপর যুগের কোনো অজানিত'।

অদ্ভুতভাবে কবির মনে হয় সর্বদেহ মন থেকে এতদিনের অভ্যাসের জাল যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। এসেছে এক ছুটির দিন, মুক্তির দিন এবং এই মুক্তির চাবিকাঠি ছিল মৃত্যুর হাতে—সে-ই কবির পুরনো জন্মের জীর্ণ উত্তরীয়

উড়িয়ে দিয়ে গেছে। এতদিনে যেন পাওয়া গেল অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্য। কবি এই মৃত্যুবাহিত নতুন জন্মে সংসার যাত্রার প্রান্তে এসে নিজের বুকের মধ্যে পথিকচিত্তের মুক্তিমন্ত্র শুনতে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকে তিনি বাসাংসি জীর্ণাণির মন্ত্রেই দেখতে পেয়েছেন এখানে।

৩০১.১.১.১.১৬ : ১৬-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতায় যে ভিন্ন সুর বেজেছে তার আলোচনা আমরা স্বতন্ত্রভাবেই করবো, কিন্তু তার আভাস যেন কয়েকবৎসর আগে এই ১৬-সংখ্যক পথিক, সেই পথিক হিসাবে ইতিহাসের শিক্ষার কথাই কবি এখানে বলেছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত পুরাণপ্রসিদ্ধ জাতি লুপ্ত হয়ে গেছে, কত বিরাট বিরাট কীর্তি ধূলিসাৎ হয়েছে, গর্বোদ্ধত জাতির প্রতাপ অপমানে একশেষ হয়েছে। একদা যারা বিজয়োল্লাসে সকলকে পদানত করে রাখতো তাদের স্থান হয়েছে পথের ধূলায়, ভিখারিদের সঙ্গে একসঙ্গে। পথের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, কোনো পদচিহ্নই সে ধরে রাখেনা। আজ যার পদচিহ্ন বড়ো স্পষ্ট মনে হয়, কালই তার পদচিহ্ন মিলিয়ে যায়। সব কিছুই অনিত্য, মহাতরীও সমুদ্রে ডুবে যায়, মানুষ তার সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামনা-বাসনা ও ভালোবাসা নিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—তবু কেন কবি জানেন না, 'অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।'

৩০১.১.১.১.১৭ : ১৭-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাদুটি লেখা হয়েছিল একই দিনে—২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়োদিনে। দুটি কবিতাতেই কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে এর অমিল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যাবার দিনে সত্য কথা বলার সৎসাহস কবি অর্জন করেছেন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন—এইভাবে বিচার করলে এই সুর মূল সুরের পরিপূরকই বলতে হবে।

এতদিনে কবির চৈতন্য হয়েছে, একথা কবি বলেছেন। এক দুঃসহ অনুভূতি তাঁকে ব্যথিত করেছে, তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবী এখন 'কোন নরকাগ্নিগিরি গহ্বর' হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে মানুষের অপমান ঘটছে, তাদের অমঙ্গলধ্বনিই শোনা যাচ্ছে সর্বত্র এবং তাতে কালিমালিপ্ত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ু। যুদ্ধ লিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রণহুঙ্কারকে তার মনে হয়েছে 'আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা', 'বিকৃতির কদর্য রূপ'। একদিকে যখন আকশচুম্বী স্পর্ধা, ক্রূরতার বিসাক্ত ছোবল, বলদর্পী রণহুঙ্কার, অন্যদিকে বিপন্নকে আশ্বাস দেবার কদর্য ছলনা। রাষ্ট্রনায়করা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধলিপ্সু জাতির আর্থিক সম্পদে পুষ্ট সাময়িক বাহিনী যথেছ্ আচরণ করছে, তাদের বোমারু বিমান নরমাংসলোলুপ শকুনিকেও লজ্জা দিয়ে আরো প্রবল প্রতাপে মানুষের সংহারযজ্ঞে নেমে পড়েছে।

কবি বিধাতার কাছে শক্তি চেয়েছেন, কণ্ঠে তিনি যেন কবিকে দেন বজ্রবাণী, যাতে এইসব শিশুঘাতী, নারীঘাতী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ঘোষণা করতে পারেন। কবি এ ভবিষ্যৎবাণী করেছেনে যে নিজেদের ভস্মীভূত চিতার আগুনই হবে তাদের শেষ পরিণতি।

৩০১.১.১.১.১৮ : ১৮-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের অতিক্ষুদ্র এই শেষ এবং ১৮-সংখ্যক কবিতাটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মন্ত্রে পরিণত হয়েছে এখন। দানশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছেন, কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন।

আগের কবিতায় এই শক্তি তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, এই কবিতায় সেই শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

৩০১.১.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি —

১। 'প্রান্তিক' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে সুরের ঐক্য আছে কিনা বিচার করো।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যের শেষ দুটি কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কবির যে বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে তা বিশদ করো।

৩। 'প্রান্তিক' কাব্যের ৭-সংখ্যক কবিতার সূচনায় কবি বলেছেন — 'এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,' — কী অকৃতজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞ কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

৪। কবিতা হিসাবে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়, রসগ্রাহী আলোচনায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩০১.১.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র রচনাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। আনন্দ সর্বকাজে — অমিতা সেন

৩। রবীন্দ কাব্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৪। রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

একক-২

শেষ পর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

বিন্যাস ক্রম

৩০১.১.২.১ : রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা

৩০১.১.২.২ : শেষপর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

৩০১.১.২.৩ : আদর্শ গ্রন্থাবলি

৩০১.১.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.২.১ : রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা—

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থেই প্রথম যেন আভাস পাওয়া গেল, কবি অনুভব করেছেন এই মর্ত্যধাম থেকে তাঁর বিদায়ের বেলা আসন্ন হয়ে পড়েছে, তাই তিনি বলেছেন 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ।' বিশেষ করে এই কাব্যের 'পথিক'—অংশে সেটা একটু গভীরভাবে ধরা পড়ে। তবে একথাও ঠিক যে, 'ইমনে আজ বাঁশি বাজে মন যে কেমন করে,' তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকা গমন ও প্রত্যাগমনের মধ্যে প্রচুর কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো গানের পালা শেষ করে দিতে হবে এবার, এ কথা মনে করেই। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও সৃষ্টির এই নবস্ফূর্তি অব্যাহত ছিল। প্রচুর কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং যেসব কথা আগে বলতে হয়তো সঙ্কোচ ছিল, যেসব কথাও বলতে পেরেছেন অক্লেশে। অনেক শৈশব-স্মৃতি উঠে এসেছে, অনেক তুচ্ছ কথাও এখন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে জীবনের কত স্মৃতি যে মুখর হয়ে উঠেছে তার শেষ নেই, তবে সেই সঙ্গে পরমায়ু যে শেষ হয়ে আসছে, এর একটা রোমান্টিক বোধও প্রায়ই প্রকাশিত হয়েছে। কখনো বলেছেন—

"সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।"

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে (১৩৩৯) কবিতাকে 'বেড়াভাঙ্গা স্বাধীনতা' দেবার জন্য কবি নিয়ে এলেন গদ্য ছন্দ এবং সেই গদ্য ছন্দেই রচনা করলেন 'শেষ সপ্তক' (১৩৪২) এবং 'পত্রপুট' (১৩৪৩)। পুরনো স্মৃতি নিয়ে গল্পের মতো কবিতার সংখ্যা এসব কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি।

এরপর যেসব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কবির— 'বীথিকা' (১৩৪২), 'পত্রপুট' (১৩৪৩), 'শ্যামলী' (১৩৪৩)—সর্বত্রই মৃত্যু সম্বন্ধে একটা রোম্যান্টিক চিন্তা এসে পড়েছে। 'শেষ সপ্তকে' বলেছেন—

'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের যাত্রাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।'

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন :

'এখনো মেটেনি আশা;
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি।'

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে পাই :

'মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।'

এমনকী 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থেও কবি বলেছেন :

'কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ার চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে, তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুকনো বাঁসের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁটি মাথায়,
তখন মনে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনো কালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।'

৩০১.১.২.২ : শেষ পর্যায়ে কবিতা ও প্রান্তিক —

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় মৃত্যু সম্বন্ধে যে রোম্যান্টিক ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছিল, 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে তা একেবারে বাস্তব আকার ধারণ করেছে, কারণ মৃত্যু এখন আর কবির কাছে দার্শনিক সত্য নয়, জীবনের অভ্রান্ত ও অনিবর্য সত্য। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অত্যন্ত কঠিন অসুখে পড়েছিলেন কবি। সেরে উঠবার কোনো আশা ছিল না। এই জীবন-মৃত্যুর আলোছায়ার মধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন। কিছুটা আরোগ্য লাভের পর অক্টোবর মাসে লিখলেন

আরো পাঁচটি এবং তারপর জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াবার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন রূপ দিলেন ডিসেম্বর মাসে লেখা সাতটি কবিতায়। এই পনেরোটি কবিতা এবং তৎসহ আরো তিনটি (এই সময়ের লেখা নয়—১৪-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ১৫ বৈশাখ ১৩৪১ সাল, ১৫-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সাল এবং ১৬-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ৭ বৈশাখ, ১৩৪১ সালে)। মোট আঠারোটি

কবিতা নিয়ে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির শিরোনাম ছিল না, সংখ্যা দিয়েই এগুলি চিহ্নিত হয়েছিল।

'প্রান্তিকের' কবিতাগুলিতে এই পৃথিবীতে কবি কী পেয়েছেন, কী করেছেন তার একটা মূল্যায়নের চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি আছে তিনি যে প্রতিদিনের কান্নাহাসির জীবনচর্চায় অনিবার্যভাবেই আর থাকবেন না, সে সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি। একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা দরকার, সেটি হল, মৃত্যু এবং জীবনাবসানের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা এসেছে অত্যন্ত কম। সাধারণভাবেই রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রচলিত ধর্মমত বা dogma-তে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু গীতাঞ্জলি-পর্বে পরাণসখা, পান্থজনসখা, ঈশ্বর, তুমি, ত্রিভুনেশ্বর ইত্যাদি অভিধায় একরকম ভাবে একটা আরোধ্যের উপলব্ধি অন্তত গড়ে উঠেছিল। 'বলাকা' কাব্য থেকেই কবির মনে সে ধর্মের উপলব্ধি কিছুটা ফিকে হতে শুরু করে। একে ধর্মে বা আধ্যাত্মিকতার অবিশ্বাস ঠিক বলা যাবে না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধের প্রতি আরো দৃঢ় বিশ্বাস বলা যায়। এই চেতনারই প্রকাশ আমরা 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে দেখি। ফলে এখন আর 'মৃত্যু অমৃত করে দান' বা 'মরণের তুঁহু মম শ্যামসমান' নয়, জন্মান্তরের ভাবনায় উল্লসিতও নন কবি—চলে যে যেতে হবে, এই পরম সত্যকে যত রকম ভাবে পারেন মেনে নেবার চেষ্টা করেছেন, মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। যতই তা করেছেন ততই ফেলে আসা জীবন তাঁর কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে।

৩০১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি —

১। প্রান্তিক কাব্যের প্রকাশকাল কত?

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্যায়ের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে প্রান্তিক কাব্যের স্থান মূল্যায়ন করো।

৩০১.১.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৩। রবি জীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল

৪। রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

একক-৩

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা

বিন্যাস ক্রম

৩০১.১.৩.১ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা

৩০১.১.৩.২ : আদর্শ গ্রন্থাবলি

৩০১.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.৩.১ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন দুরকম ভাবে, অথবা আরো ভালো ভাবে বলতে গেলে তিন রকমভাবে — এক রোমান্টিক দৃষ্টিতে তাকে মহিমাময় করে, অজ্ঞাতপরিচয় বিচ্ছেদকে সহ্য করে নেওয়ার জন্য কিছু মহিমময় করে, এবং অতি প্রশান্তভাবে মৃত্যুকে এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি হিসাবে স্বীকার করে।

রোম্যান্টিক দৃষ্টির পরিচয় পাই কবির ১, ৫, ৯ ও ১৫ -সংখ্যক কবিতায়। ১-সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে বড়ো আসন দিয়েছেন, বলেছেন—

‘বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে’
অলোক আলোকতীর্থ সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।’

৫-সংখ্যক কবিতায় অকৃতার্থ অতীত এবং অতৃপ্ত তৃষ্ণার হাত থেকে মুক্তি পাবেন বলে কবি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে উন্মুখ — ‘বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।’ বরং জীবনের যেসব প্রতিবন্ধকতা তাঁকে সেখানে যেতে বাধা দিচ্ছে তাদের প্রতিই তার অসন্তোষ। সে অসন্তোষ ধরা পড়েছে এই ধরনের পংক্তিতে —

‘পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।’

৯-সংখ্যক কবিতায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার যে বেদনা, অস্পষ্টভাবে তার আভাস পাওয়া গেলেও মৃত্যুকে আরো মহিমময় দৃষ্টিতেই কবি দেখেছেন, তাই আলোকের দেবতা সূর্যকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

'হে পূসন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

১৫-সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুকে সূর্যের সমমর্যাদা দান করেছেন। মৃত্যু যখন নিজেকে প্রকাশ করেনি, দৈত্যের মতো পুঞ্জিত মেঘ যেন 'ছায়ার প্রহরীব্যূহে' সূর্যকে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যুর আবির্ভাব যেই ঘটেছে, বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ, চরাচরে

আনন্দের উচ্ছ্বসিত শিহরণ জেগেছে। কবি নিজেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে উঠেছেন—

'আদি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূসম।'

আর-এক ধরনের কবিতাতেও মৃত্যুবন্দনা আছে, কিন্তু সেখানে কবির বিচ্ছেদের যন্ত্রণা একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়। বোঝা যায়,কবি এই অনিবার্য বিচ্ছেদকে মানিয়ে নেবার জন্য একধরনের সান্ত্বনা খুঁজছেন যা বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্রে তাঁর কাছে আসেনি, এসেছে ভাববাদী কল্পনায়। যেমন ২-সংখ্যক কবিতাতেও মৃত্যুর 'অর্মত্য প্রভাতে'-র কথা আছে, অরুণকিরণের বন্দনা আছে, তবু যখন কবি বলেন—

'ওরে ভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে'—

আমরা দেখি কোথাও একটা ব্যথার কাঁটা ছিন্ন বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে।

৩-সংখ্যক কবিতায় কবি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তা আরো স্পষ্ট। যে বাস্তব পৃথিবী তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছে, প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছে, প্রচুর সংবর্ধনা দিয়েছে, সেই পৃথিবীর জনতার চেয়ে মৃত্যুর একাকীত্বকে তিনি অনেক মহীয়ান বলে ঘোষণা করেছেন—

'জানিলাম একাকীর নাই ভয়
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।'

৪-সংখ্যক কবিতাতেও মৃত্যুকে অনেক উঁচু স্থানে বসাবার চেষ্টা আছে, কারণ এ সংসারে খ্যাতি অর্জন করতে নিয়ে 'সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়' নাম ওঠাতে হয়েছে, অনেক বেচাকেনা করতে হয়েছে, 'পরের মুখের মূল্যে' নিজেকে মূল্যবান করে তুলতে হয়েছে। এর ফলে একেবারে জন্মের প্রথম শুভক্ষণে প্রকাশের যে আনন্দ কবির ছিল, আজ তা ধূলিমগ্ন, 'নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার/

দীপধূমে কলঙ্কিত।' তারপরই সেই পরমের সঙ্গে হবে কবির মিলন, কারণ সেই প্রথম প্রকাশের আনন্দকে

'ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নান তীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।'

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান—

'তোমার ওই ঝর্ণাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমায় ভাসিয়ে দিলাম কোনখানে।'

সংসারের পণ্যশালায় নিজের পরিচয় তুলে ধরতে কবিকে যে 'নানা চিহ্নে নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে' সহস্র রকম করে তুলে ধরতে হয়েছিল, ৮-সংখ্যক কবিতাতেও তা বলেছেন। এখন মৃত্যুর মধ্যে তিনি খুঁজে পাবেন 'আপনাতে আপনার নিগূঢ় পর্ণতা।

এই পূর্ণতার সান্ত্বনা ১০-সংখ্যক কবিতাতেও আছে এবং কবির আনন্দের আতিশয্য দেখেই মনে হয় কবি নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন—

'কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি'-পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।'

কয়েকটি কবিতায় আছে শান্তভাবে মৃত্যুর আসন্ন রূপকে ধ্যান করার চেষ্টা। এই সমাহিত দৃষ্টির সঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে রোমান্টিক ভাবালুতার তফাৎ কোথায়, সেটা ধরা পড়বে যদি প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ললাট-টীকা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি তিনটি স্মরণ করি। পূরবী কাব্যগ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'অস্ত সিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্তপানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।'

এই সমাহিত ভঙ্গি খুঁজে পাই আমরা ৬-সংখ্যক কবিতায়। কবির অনিঃশেষ তপস্যা, প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত সারস্বত সাধনা আজ সব গ্রহণ করার জন্য দ্যুলোকে ভূলোকে মৃত্যু তার কমণ্ডলু বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে সব দিতে হবে কবি জানেন, তার জন্য কবির দুঃখ নেই, কারণ দিতে হয় এটাই নিয়ম, তিনি তা বোঝেন। সত্যই বোঝেন যে, গানেও সে কথা কবি আগে বলেছেন—

'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।'

১১-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, কলরবমুখর খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে এবার উঠে আসার সময় হয়েছে। অন্তরে গভীরে শুনতে পেয়েছেন কবি ভৈরবের আহ্বান। কবি তাকেও বরণ করে নেবেন; তবে এমন আশা করেন না মৃত্যু তাঁকে অমর করে রেখে দেবে। অনামিক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে কবির কীর্তি — 'খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।'

আরো স্পষ্ট করে এ কথা বলেছেন ১২-সংখ্যক কবিতায়। সেখানে কবির বক্তব্য, এবার শেষের আবগাহন সাঙ্গ' করতে হবে। সংসারকে অনেক দিয়েছি, সংসার চিরদিন আমাকে মনে রাখবে, এ রকম প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হবে এই মুহূর্তে। কারণ যে মানুষ সত্যিই ধনী, সে তার অন্তরেই ধনী, বাইরের পৃথিবী তাকে কী মূল্য দিল তাই দিয়ে তার প্রকৃত মূল্য যাচাই হয় না। বাইরের খ্যাতি এবং মূল্য যত দিন যায় তত কমে আসে। কবি নিজেকে বলেন, তোমার অন্তরের সম্পদ খুশি হয়ে যা প্রকাশ করেছে, বনের ফুল ও ফলের মতো বনেই ঝরে যাক তা,—

'জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে';

এরপর মৃত্যু এসে হাত বাড়ালে জীবনের সেই সামান্য সঞ্চয় তুলে দিতে হবে তার হাতে— 'এ জনমে শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি'। এই রকম শান্ত সমাহিত অথচ গভীর অনুভবের কবিতাই এ কাব্যগ্রন্থের সম্পদ।

৩০১.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি—

১। 'প্রান্তিক' কাব্যে মৃত্যুকে আসন্ন দেখে কবির মনে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩০১.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি—

১। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা — নীহার রঞ্জন রায়

২। এসেছে রবির কর — হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা — ধীরানন্দ ঠাকুর

একক-৪

প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা

বিন্যাস ক্রম

৩০১.১.৪.১ : প্রান্তিক কাব্যের জীবনতৃষ্ণা

৩০১.১.৪.২ : প্রান্তিক কাব্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি বিষোদ্‌গার

৩০১.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.১.৪.১ : কবির জীবনতৃষ্ণা

প্রান্তিক কাব্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার জন্য বিশিষ্ট হলেও কয়েকটি কবিতায় জীবনরসের রসিক কবির জীবনতৃষ্ণার যে গভীর স্পর্শ পাই তাও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই রূপে রসে গন্ধে ভরা পৃথিবীকে কবি কী চোখে দেখেছেন, কত ভালোবেসেছেন এবং কীভাবে তাঁর ভালোলাগার ডালি সাজিয়ে তুলেছেন সে তো আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং মৃত্যুর আশঙ্কা যখন চরম সত্য হয়েই দেখা দেয় তখন আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সেই ভালোবাসার ধন তাঁর অন্তরে যে অদৃশ্য প্রীতির সূত্রে কীভাবে বাঁধা পড়তে চাইবে, তা অনুমান করা যায়।

৭-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, জীবনে তিনি অনেক আনন্দ পেয়েছেন, দুঃখও পেয়েছেন অনেক। অনেক মানসীর ছবি এঁকেছেন বুকের রক্তে, দুঃখনাগিনীকে ব্যথার বাঁশির সুরে খেলিয়েছেন। তারা হয়তো অনেক দূরের স্মৃতি, কিন্তু হৃদয়ের চিত্রশালায় আজও অমলিন। আসলে একটু-একটু করে সমস্ত জীবন দিয়ে রচনা করেছেন একটি পুষ্পমালিকা। যা পেয়েছেন যা পাননি, সমস্তই তাঁর জীবনের সম্পদ। কবি মৃত্যুক মহীয়ান না করে জীবনের সেই মাধুরীকে স্মরণ করেই বলেছেন :

'আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার',

যা-গাইবেন তা জীবনেরই গান, মৃত্যুর নয়। কবির এই কথায় আমরা তাঁর পুরনো বাণীই শুনতে পাই—'জীবনের ধন কিছুই যায়না ফেলা।' অথবা তাঁর সেই কবিতা—

'যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি, তুলনা তাই নাই।'

গানে কবি বলেছিলেন 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে/বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে'। ১৩-সংখ্যক কবিতাতেও শুনি সেই কথা। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য একা যেতে হয় :

'তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।'

গানে এ কথাও আছে— 'যে পথে যেতে হবে, সে পথে তুমি একা।'

১৪-সংখ্যক কবিতায় জীবনের জয়গানে কবি মুখর :

'কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে ; .....
সব দিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে।'

সেই জন্যই মৃত্যুকে বন্দনা কবি করেননি এ কবিতায় এবং অন্য কাউকে নমস্কার করার কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন—

'এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে কবি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।'

৩০১.১.৪.২ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি বিষোদ্‌গার

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ কবির মারাত্মক অসুস্থতা এবং ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভের সময় লেখা বলেই মৃত্যুচেতনা এবং সারাজীবনের হিসাব নিকাশের একটা ব্যাপার তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের শেষ তিনটি কবিতাকে কিছুটা অভিনবই বলা যায়। তার মধ্যে ১৬-সংখ্যক কবিতায় অবশ্য কবির আগ্রাসন এত স্পষ্ট নয়, কিন্তু ১৭-সংখ্যক ও ১৮-সংখ্যক কবিতায় যে ভাসায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাতে একটু বিস্মিতই হতে হয়।

কারণ পরে অনুমান করা যাবে, আপাতত একটুকু মনে করা যাক যে জীবনের প্রথম প্রহরে, এবং শেষ প্রহরেও, এ জাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথ একেবারে লেখেননি এমন নয়। একবার একথা বলেছিলেন 'প্রশ্ন' কবিতায়—

'যাহারা তোমার বিসাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছে? তুমি কি বেসেছ ভালো?'

একেবারে শেষ পর্বের কবিতাতেও এই ধরনের প্রতিবাদ বা দিনবদলের পালার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। 'জন্মদিনে' কাব্য গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায় বলেছেন :

'দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।'

২২-সংখ্যক কবিতাতেও বলেছেন :

'আসিবে বিধির কাছে হিসাব চুকিয়ে—দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।'

'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন 'ঐ মহামানব আসে' — সেকি দিনবদলের পালাকে মনে করেই, কে জানে! ১৪-সংখ্যক কবিতায় এ কথাও বলেছেন —

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনায় ভূমিকা তাহার।'

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায় আছে শুধু এক অস্পষ্ট আভাস, কবি জানিয়েছেন —

'দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেস
গর্বোদ্ধত প্রতাপের; অন্তর্হিত বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত।'

তবে ১৭-সংখ্যক কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের প্রকৃতি একেবারে পুরোপুরি অনাবৃত করে দিয়েছেন—

'দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ'।

কবি বিধাতার কাছে শক্তি চেয়েছেন যাতে উচ্চকণ্ঠে তিনি ধিক্কার জানাতে পারেন অশুভ পশুশক্তির বিরুদ্ধে—

'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আন বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎষা-' পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'।

১৮-সংখ্যক কবিতায় কবির প্রতিবাদ সংহত স্ফটিক হয়ে জ্বল জ্বল করছে—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোগাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

এই বিদ্রোহের মধ্যে এমন এক তেজ ছিল, শোসক স্বৈরাচারী শক্তির প্রতি প্রতিবাদের এমন অকৃত্রিম শক্তি ছিল যে এ কবিতা এ যুগের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকেও আবিষ্ট করেছিল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।।

প্রশ্ন হচ্ছে দীর্ঘ কাব্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে এত কম মন্তব্য করেছেন কেন, প্রান্তিকের মতো কাব্যগ্রন্থে কেনই বা এ কথা বলতে গেলেন। আমাদের মনে হয়, কবির 'ছোট ইংরেজ - বড়ো ইংরেজ' তত্ত্ব এর জন্য খানিকটা দায়ী। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে বানিয়া ইংরেজ শাসনকর্তা হিসেবে এখানে রাজত্ব করছে তারা প্রকৃত ইংরেজ নয়, ছোট ইংরেজ। প্রকৃত ইংরেজ বা বড়ো ইংরেজ আছে ইংলন্ডে, যারা সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য-শিল্পে পৃথিবীর সেরা। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, একথাও তিনিই বলেছিলেন। তাহলে 'প্রান্তিক' কাব্যে তাঁর বিশ্বাস টলে গেল কী করে! আমাদের ধারণা বিশ্বাস অনেক আগেই টলেছিল, কিন্তু এক বিশাল ভাবমূর্তির অধিকারী 'গুরুদেব' এ বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে চাননি। এখন মর্ত্যভূমি থেকে বিদায়লগ্ন যখন আসন্ন, তখন তাঁর মনে হয়েছে সত্য কথা এবার উচ্চারণ করা দরকার। সত্য ভাসণে কোনো দিনই কুণ্ঠিত হননি তিনি, এখনও তা হবার কোনো কারণ ছিল না।

দ্বিতীয় কারণও একটি ছিল। মহাযুদ্ধের সঙ্কেত বা পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথের মতো 'ঋসিকল্প' কবিরা পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনি 'শঙ্খ' কবিতায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে, সইব!' এবারেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আসন্ন, কবি অন্তগর্ত রক্তস্রোতে তার আগাম সংকেত পেয়েছেন। এবং সেই কারণেই এবার, তিনি কবি হিসাবে তাঁর দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন, তাঁর সুস্পষ্ট ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, নিজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই অশক্ত শরীরেও। আমরা যারা মনে করি তিনি গজদন্তমিনারে বাস করতেন এবং পৃথিবীর সমস্যা এড়িয়ে, কেবল সৌন্দর্যের সাধনা করে গিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এই কবিতা কে সমুচিত উত্তর বলে মনে করা যেতে পারে।

৩০১.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রান্তিক' কাব্যের স্থান নির্ধারণ কর।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যে মৃত্যুকে আসন্ন দেখে কবির মনে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

৩। 'প্রান্তিক' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে সুরের ঐক্য আছে কিনা বিচার কর।

৪। 'প্রান্তিক' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির তীব্র জীবনপিপাসা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলি অবলম্বনে এই জীবনপিপাসার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৫। 'প্রান্তিক' কাব্যের মৃত্যুচেতনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। 'প্রান্তিক' কাব্যের শেষ দুটি কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কবির যে বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে তা বিশদ কর।

৭। 'প্রান্তিক' কাব্যের ৭-সংখ্যক কবিতার সূচনায় কবি বলেছেন—'এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে',

কী অকৃতজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞতা কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

৮। কবিতা হিসাবে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়, রসগ্রাহী আলোচনায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩০১.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ	:	বিশ্বপতি চৌধুরী
২। রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (২)	:	প্রমথনাথ বিশী
৩। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা	:	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৪। রবীনদ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা	:	ধীরানন্দ ঠাকুর
৫। চিত্রগীতময়ী রবীনদ্রনাথ	:	ক্ষুদিরাম দাস
৬। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	:	আবু সয়ীদ আইয়ুব
৭। এসেছে রবির কর	:	হীরেন চট্টোপাধ্যায়

পর্যায় গ্রন্থ : ২
পুনশ্চ

একক ৫
পুনশ্চ — গদ্য কবিতার নিদর্শন

বিন্যাস ক্রম

৩০১.২.৫.১ : পুনশ্চ - গদ্যকবিতার নিদর্শন

৩০১.২.৫.২ : পদ্মা ও কোপাই-এর তুলনা : দুই পর্বের কবিতা

৩০১.২.৫.৩ : গল্পবলার ধরণ/কাহিনীর ধরণ

৩০১.২.৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৫.১ পুনশ্চ - গদ্যকবিতার নিদর্শন

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত। পুনশ্চ'এর ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, গদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি। 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় কাব্যগুলিকে পদ্যের মতো খন্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" আসলে গদ্য পদ্যের বিবাদভঞ্জন করতে চেয়েছেন কবি। 'লিপিকা' ছিল পরীক্ষামূলক সূচনা আর পুনশ্চ সেই পরীক্ষার সার্থক রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে, "গদ্য কাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য কাব্যের ভাষা ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চারণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।" এই নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ গদ্যছন্দে কবি যখন কবিতা লিখতে চাইলেন তখন কাব্যিক ভাষারীতি প্রকল্প ত্যাগ করলেন।

পুনশ্চ এই নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চিঠির শেষে পুনশ্চ-এ যে কথা বলতে বাকি থাকে সেই বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে পুনশ্চ অংশে। বর্তমান জীবনের বাস্তব ছবি, ভাবনা, বক্তব্য সব তো পুনশ্চে থাকলই, তার সঙ্গে যুক্ত হলো রং ও ছবির প্রকাশমাত্রা। সুকুমার সেন মনে করেন — "বয়সের দৃষ্টি এইভাবে যথোচিত পরিস্ফুট হয়। গদ্যকবিতার মূললক্ষণ - বিষয়মাত্রিক যতি, অসম ছন্দঃস্পন্দ এবং গদ্যোচিত বাচনভঙ্গি সবই এই কবিতাগুলিতে আছে। নিছক গদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার তফাৎ পংক্তি সাজানোয় নয়, ছন্দের দোলায় আর বাচনরীতিতে। নিছক গদ্য ও নিছক পদ্যের মাঝখানে গদ্যকবিতা। গদ্যের ছন্দ বাক্যার্থ অনুসরণ করে।" যেখানে

অর্থযতি, সেখানেই শ্বাস যতি সমপতিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা বাংলা কাব্যের প্রথম এবং তাঁর গদ্য কবিতায় বাংলা কাব্যের পরিধি প্রসারিত হয়েছে।

গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাহিনী। ছেলেটা, বাঁশি, শেষচিঠি, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, ভীরু, প্রথম পূজা, শুচি, রংরেজিনী ও মুক্তি এই সবই বিখ্যাত কাহিনী কবিতা।

৩০১.২.৫.২ পদ্মা ও কোপাই-এর তুলনা : দুই পর্বের কবিতা

পদ্মার তীরে বোটের উপর বসে কাটানো দিনগুলি রবীন্দ্রজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ-স্মৃতির সম্পদ। যেখানে বসে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র মতো কাব্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, নৈবেদ্য, গল্পগুচ্ছ, প্রবন্ধ, ছিন্নপত্র, পঞ্চভূত এখানে বসেই লিখেছিলেন। এই পদ্মা যেন রবীন্দ্র সৃষ্টির রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে উঠেছে - যা প্রখর যৌবনের প্রতীক। সেই বিগত যৌবনের কথাকে স্মরণ করতে কোপাই-এর তীরে বসে কবি কোপাই ও পদ্মার মধ্যকার জীবন যাপনের রূপচিত্রকে 'পুনশ্চ'র 'কোপাই' (ভাদ্র ১৩৩৯) কবিতায় তুলে ধরেছেন। যেখানে একদিকে রয়েছে পদ্মা, অন্যদিকে কোপাই। স্মৃতি রোমন্থনের পর্যায় থেকে কবি তার অতীতের কথাকে তুলে ধরে জানিয়েছেন পদ্মার ঐশ্বর্য্যের কথা। যেখানে রয়েছে যৌবনের উচ্ছ্বাস, উদ্বেল বেগ যা বাঁধ না মানা চালে চলেছে। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "পদ্মাকে যে দেখেনি বাংলাদেশকে দেখেনি সে; পদ্মাকে যে জানে না বাংলাদেশকে জানে না সে; পদ্মাকে যে বোঝেনি বাংলাদেশকে বোঝেনি সে; যা কিছু দেখা জানা বোঝা সমস্ত সংহতি এই নদীটির মধ্যে।"(শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ) যার এক তীরে রয়েছে বাঁশবন, আমবন, পুরনো বটগাছ, পোড়ো ভিটে, সর্ষে ক্ষেত, বেতের জঙ্গল, ভাঙ্গা নীলকুঠী। যা সভ্যতার সচলতা ও জীবনের সতেজতার কথা বলে চলেছে। অন্যদিকে আছে ধূ ধূ প্রান্তর, নিরাসক্ত নিঃস্ব বালুচর। যা আসলে জীবনের শেষে শূন্যতার কথাকে প্রতীকায়িত করেছে। যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বটে। তারপরেও যে জীবনের বহু পথ চলা বাকি। যার কথা কবি কোপাই-এর তীরে বসবাসকারী জীবনাচরণের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। জীবনের মধ্যাহ্নকে পদ্মার সাথে তুলনা করে কবি লিখেছেন —

"সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়-
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।"

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত বিগত জীবনের ফেলে আসা যৌবনের কথা যার কারণে কোনো বাধাই যেন বাধা বলে তখন মনে হত না।

তারপর রবীন্দ্রনাথ এলেন বোলপুরে, শান্তিনিকেতনে কোপাই-এর ধারে। এখানে কবি দেখলেন এক বিরল মাঠের প্রান্তর, সাঁওতাল পল্লী। আর কোপাই যেন নিস্তরঙ্গ জীবন, যার কোন গরিমা নেই, ঔদ্ধত্য নেই। যার চলা কবির কাছে অনার্য্য সংস্কৃতির সদৃশ্য মনে হয়েছে। আসলে জীবনের সাথে এই নদীর যোগ অনেক। যেন জীবন যাপনের অঙ্গই হয়ে উঠেছে কোপাই। যার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন-

"কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত,
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।"

কোপাই তীরের বসবাসকারী মানুষের জীবনের সাথে পদ্মাতীরের জীবনের প্রচুর বিভেদ। সেখানে রয়েছে অতীতে বসবাসকারীর জীবনযাত্রার নিদর্শন, এখানে আছে সচল জীবন। পদ্মার ভয়ানক গ্রাস গ্রামের পর গ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর কোপাই জীবনকে, সভ্যতাকে বহন করে চলেছে। যেখানে আম-জাম, আমলকি, সবুজ চাষের ক্ষেত, পথিক, চাষী সেই নদীর সাথে সাথে একাত্ম হয়ে চলেছে আপন ছন্দে। যার ভাষা সাধু ভাষা নয়, গৃহস্থপাড়ার ভাষা। কোপাই-এর মতো কবিও এজীবনকেই মনে মনে বরণ করে নিলেন।

"কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিল,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গলে ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।"

কোপাই পারের সুন্দর গ্রাম্য চিত্র কবি জীবনের সার্বিক রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে - যেখানে কোন দৈন্যতা নেই। তার সকল মলিনতা ধুয়ে গেছে কোপাই-এর নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলস্রোতে।

আসলে পদ্মা ও কোপাই কবির জীবনের দুই কালকে ফুটিয়ে তুলেছে - জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের কথা এবং জীবনসায়াহ্নের কথা। পদ্মার কাল কবিজীবনের শ্রেষ্ঠকাল হলেও চিরস্থায়ী নয়, যে সত্যতা কোপাই-এর মধ্যে রয়েছে, সমকালীন জীবনের ছবি। তাই 'কোপাই' কবিতায় ফেলে আসা জীবনের সাথে যাপিত একালের জীবনের তুলনামূলক দুই চিত্রকে তুলে ধরতে বর্ণনা প্রসঙ্গে দুই নদীর কথা এনেছেন কবি।

৩০১.২.৫.৩ গল্পবলার ধরণ/কাহিনীর ধরণ

'পুনশ্চ'-এ(১৩৩৯) রয়েছে গদ্য কবিতার সম্ভার। এই কাব্যের একাধিক কবিতায় রয়েছে গল্প কাহিনী। যা পড়লে লিপিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলির কথা মনে পড়ে। তবে নিতান্তই গল্পের কথা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে কবিতার ছন্দের বন্ধনে বেঁধেছেন। কবিতা প্রচলিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়, গদ্য কবিতার ছন্দ। যেগুলি পড়তে পড়তে আমরা দেখতে পাই, জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্যকে। যাতে রয়েছে না পাওয়ার বেদনা, অবহেলিত মানব জীবন, সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণার বিষাদঘন বর্ণনা। যা বলার ভঙ্গিতে পাঠক মনে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। যেমন- সাধারণ মেয়ে, অপরাধী, ছেড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, পত্রলেখা ইত্যাদি কবিতা।

'সাধারণ মেয়ে'(শ্রাবণ, ১৩৩৯)কবিতাটি গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গিতে কথোপকথনের মাধ্যমে সাধারণ মেয়ের জীবন কাহিনী অসাধারণ হয়ে উঠেছে। যে শরৎবাবুর গল্পের বইয়ে মালতীকে যেন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, খ্যাতিতে শ্রেষ্ঠ করে নরেশের সমতুল্য করেন। যাকে নরেশ একদিন তুচ্ছ করেছিল তাকে সবাই আবিষ্কার করবে শুধু বিদূষী বলে নয়, অসামান্য নারী বলে। যাকে সমগ্র বিশ্ব সম্মানের আসনে বসাবে। এভাবেই মালতীর

অপমান আক্রোশ বেদনার উপশম হবে।যার ফলে সে হয়ে উঠবে অসাধারণ। সাধারণ মেয়ে মালতীর এই দুঃখ যেন সকল অসহায় নারীর বেদনার ভাষা হয়ে উঠেছে কবি বর্ণনার গুণে।

'অপরাধী'(ভাদ্র, ১৩৩৯) কবিতায় তিনু যে সহজ সরল বালক। তার সহজতার গুণেই সে কথকের মন জয় করেছে। তিনু সকলের কাছে সমান। সকলের উপকার করে, ধারও দেয়। কিন্তু ধার আদায়ে সে পাকা নয়, ভুলেও যায়। এই সরলতাই তাকে কবির ভালোবাসার কারণ। তাই কথক বলেছেন -

"তোমাকে আমি বলি,ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে -
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ বলে
ভালো-মন্দ পেরিয়ে।"

শিশু মনের চঞ্চলতা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সে ঘৃণার পাত্র নয়, তার মনকে জয় করে নিলে তার ভুল গুলি চোখে আর পড়বে না। সব অপরাধ ক্ষমায় পরিণত হবে।

'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' (শ্রাবণ, ১৩৩৯) কবিতার শুরু হচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গিতে। যেখানে সুনৃতা ও অনিলের প্রেম জাতের বিচারের কাছে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। তাই বাড়ি ছেড়ে সুনৃতা চলে যেতে উদ্যত। কিন্তু যার জন্য ঘর ছাড়তে রাজি হল সুনৃতা সেই প্রেমিক অনিল তার বাবার মত করাতে পারল না। যা চিঠি মারফত জানিয়ে দিল -

"বাবার মত করতে পারবো নিশ্চিত ছিল মনে,
হলো না কিছুতেই
কাজেই-"

অবশেষে সুনৃতার বাড়ি এসে তার ঘরে অনিল নিজের লেখা চিঠিগুলো দেখতে পেল। প্রিয়তমা অভিমানে চলে গেল দূরে, পড়ে রইলো স্মৃতি হিসেবে কিছু চিহ্ন। যার বর্ণনা আছে কবিতায়, যা আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

'ক্যামেলিয়া'(শ্রাবণ ১৩৩৯) কবিতায় কমলার প্রতি কথকের হৃদয় উপজাত প্রেম কিভাবে ক্যামেলিয়া ফুলের সৌন্দর্য্যের সাথে একাকার হয়ে প্রকাশ পেল তার কথা আছে। আসলে ফুল তো সৌন্দর্য্যেরই বহিঃপ্রকাশ। তাকে তনুকা দিয়েছিল টবসহ ক্যামেলিয়া ফুলের গাছটি।যাকে নিয়ে সাঁওতাল পরগনায় ঘুরতে গিয়ে কমলার সাথে দেখা। কথক ভেবেছিল ক্যামেলিয়া ফুলটি সাঁওতাল মেয়েকে দিয়ে পাঠাবে কমলার কাছে। কিন্তু সম্ভব হয় না। কারণ -

"বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর কালো করেছে।"

ফুলটি তার যথাযথ স্থান পেয়েছে। হয়তো কখনো আবার আগের মতই তার প্রেরিত ফুলকে প্রত্যাখ্যান করত। যা কথককে বেদনা দিত। তাই সাঁওতাল মেয়েটি অজান্তেই ফুলটি কানে পরেছিল। এক পাত্রে প্রেম অন্য

পাত্রে সহজে গৃহীত হলো। এভাবেই কবিতাটিতে সুন্দর প্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শহুরে মেয়েটির জন্য যে প্রেম কথকের মনের কোণে জেগেছিল, সঙ্গে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর সমক্ষে তা প্রকাশে সঙ্কোচ ছিল। সাঁওতাল পরগনায় ফুটে ওঠা ফুলটি সার্থকতা পেল সাঁওতালি মেয়েটির খোঁপায়।কবির এই বর্ণনায় ঘটনার মোড়ের মধ্যে কবিতার মূল বক্তব্য কবিতাটিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

'পত্রলেখা'(আষাঢ় ১৩৩৯) কবিতাটিতে প্রিয়জনের চলে যাওয়ায় কথকের মনে যে বিচ্ছেদ বেদনা প্রকাশিত। প্রিয়ের দেওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে সে খুঁজে পায় প্রেমের স্মৃতি। এই চলে যাওয়া, না বলে চলে যাওয়া বড়ো আকস্মিক। তাই পত্র লিখতে বসেও লেখা হয়ে ওঠে না — "তুমি চলে গেছো/বাকি আর যতকিছু/হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।" কেবল এই চলে যাওয়াটাই সত্য হয়ে উঠেছে। রয়ে গেছে স্মৃতির পাতায় প্রিয়জনের ভালোবাসা। যাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে প্রাত্যহিক সাংসারিক দায়িত্ববোধ।

এইভাবে পুনশ্চের কবিতাগুলিতে কবি গল্পকাহিনীর দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ড ঘটনাগুলিকে তুলে ধরেছেন অসাধারণ কবিত্ব শক্তির দ্বারা। যার ফলে কবিতাগুলিও বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

৩০১.২.৫.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থটি রচনা প্রেক্ষিত উল্লেখ করো।

২। 'পুনশ্চ' গদ্য কবিতার নিদর্শন — বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

একক ৬

পুনশ্চ কাব্যে রঙের ব্যবহার

বিন্যাস ক্রম

৩০১.২.৬.১ : পুনশ্চ কাব্যে রঙের ব্যবহার

৩০১.২.৬.২ : বাস্তবোচিত বর্ণনার কৌশল

৩০১.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৬.১ : পুনশ্চ কাব্যে রঙের ব্যবহার

রং অনেক সময়ে এক একটি বিষয়ের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হয়। তাই রং ব্যবহারের দ্বারা কাব্যসাহিত্যের অন্তর্নিহিত অনেক বিষয়বস্তুকে সহজেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যার ফলে সেই বিষয়বস্তুটি বা কবি কথিত বক্তব্যটি সহজেই পাঠকের কাছে ধরা দেয়। পুনশ্চ (১৩৩৯) কাব্যের একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রঙের ব্যবহার করে সেই কবিতার বিষয়কে অনেক গভীরতা দান করেছেন। যার ফলস্বরূপ কবিতাগুলির ভাবটি প্রতিচ্ছবির মতো আমাদের চোখে ফুটে ওঠে। এই কাব্যগ্রন্থের রং প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই রংরেজিনী (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) কবিতাটির কথা বলতে হয়। যে কবিতায় দিগ্‌বিজয়ী পন্ডিত শঙ্করলাল তার মলিন পাগড়ীকে রাঙানোর জন্য রংরেজির ঘরে যান পাগড়ীর যে মলিনতা তা আসলে মনের অভ্যন্তরে। যাকে বাইরের রং এ দূর করা সম্ভব নয়। কুসুম ফুলের ক্ষেত মেহেদীর বেড়া সবুজ প্রান্তে জসিম রংরেজির বাস, তার মেয়ে আমিনা বাবার সাথে রং বাটে রঙে রঙ মেলায়। আর-

"বেনিতে তার লাল সুতোর ঝালর
চোলি তার বাদামী রঙের
শাড়ি তার আসমানী।"

সুন্দর রঙিন সজ্জায় সজ্জিত আমিনার অন্তরের পবিত্রতা বাইরের রঙে প্রকাশিত। এই রঙের দ্বারা কবি আমিনাকে আমাদের চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আমিনা হয়ে উঠেছে কোনো নারী যে শঙ্করলালের পাগড়ীতে জাফরানি রং করতে ব্যস্ত, পাগড়ী ঘাসের উপর মেলতে গিয়ে দেখল তাতে লেখা আছে "তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে। " অন্তরে তার শ্রীপদকে স্থান না দিয়ে কেবল ললাটে শিরোধার্য্য করলে হৃদয়ের কোনো গভীর অনুভব প্রকাশিত হয় না। তাই তাকে অন্তরের মধ্যে স্থান দেওয়ার কথা বলে। রঙিন সুতো দিয়ে আমিনা শঙ্করলালের পাগড়ীতে লিখে দেয়- "পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে।" হৃদয়ের গহনে তাকে অনুভব করতে হলে তাকে হৃদয়মন্দিরের আসনে বসাতে হবে। সেই কথাই হয়তো শঙ্করলালের কাছে অজানা ছিল, সেই সত্য অনুধাবন করতে পেরে আমিনার দ্বিতীয় চরণের মধ্য দিয়ে রঙিন সুতো দিয়ে লিখে তাকে স্নেহ প্রেমের হৃদয়ানুভবে ঋদ্ধ করে তুলল যাতে দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।তাই দুদিন পরে

এসে শঙ্করলাল বলে-"রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,/আর পাব না খুঁজে।" রংরেজিনীর হাতের ছোঁয়ায় শঙ্করলালের হৃদয়ে নতুন সত্য জেগে উঠল। রঙিন সুতো শুধু তার পাগড়ীকে নয় মনের সব দীনতা মলিনতাকে দূর করে দিল, সকল আভিজাত্য হয়ে গেল বিলীন। সত্যের আলোয় জীবন হল উদ্ভাসিত। শঙ্করলাল হিন্দু পণ্ডিত, আমিনা রংরেজিনী ইসলাম সম্প্রদায়ের। এই কাহিনীর আড়ালে এক সম্প্রীতির গভীর সংবেদনশীল মর্মবাণী লুকিয়ে আছে।

অন্যদিকে 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কবিতায় লাল শতরঞ্জের চৌকো চৌকো খোপের মত সুনৃতা তার পরিবারের বদ্ধ জীবনের স্বরূপ আভাসিত। এখানেও রং যেন জীবন যাপনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। আর আকাশের নীলের মতো উদার মুক্ত প্রেমের কথাগুলি লিখেছিল অনিল নীল রংয়ের কাগজে। যে প্রেমের গভীরতা হেতু সুনৃতা বাড়িত্যাগ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি। কারণ মাঝে এসেছিল পারিবারিক বাধা, জাত্যাভিমান। শেষে অনিল সুনৃতার ঘরে এসে দেখে তার দেওয়া সব জিনিসগুলি যত্নে রাখা আছে-

"দুটি ফুল লাল ফিতেই বাঁধা
মেডেন হেয়ার পাতার সঙ্গে
শুকনো প্যান্সি আর ভায়োলেট।"

পরিণতিহীন প্রেমের রেখে যাওয়া কিছু স্মৃতি, ফুরিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মত শুকিয়ে যাওয়া কিছু ফুল, যা বিচ্ছেদ বেদনার কথাকে ব্যক্ত করে।

'পত্রলেখা' (আষাঢ় ১৩৩৯) কবিতায় প্রিয়তম মানুষটি দূরে চলে গেছে। সে তার প্রিয়তমাকে প্রতিনিয়ত চিঠি লিখতে বলেছে। কি লিখবে তা ভেবেই পাচ্ছে না কথক, এখানে রংয়ের ব্যবহার ও সঙ্গে আছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত উপকরণের ছবি, কথোপকথনের বৈচিত্র্যেপ্রকাশিত।

"কাঁচি ছুরি গালা লাল ফিতে
কাচের কাগজ চাপা
লাল নীল সবুজ পেন্সিল
গিয়েছিল তুমি চিঠি লেখা চাই।
একদিন পরে পরে"

মনের বিভিন্ন কথা কে ব্যক্ত করতেই বিভিন্ন রঙের পেন্সিল এর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন রঙ আসলে সুখ দুঃখের যাবতীয় বৃত্তান্ত। যে কথা প্রতিদিন জানাতে বলেছে কিন্তু প্রিয় মানুষকে কি লিখবেন ভাবতেই পারছেন না। তাই লাল নীল সবুজ পেন্সিলের বিচিত্র কথাকে বিশ্লেষণ ও প্রেরণ করা প্রসঙ্গে এই রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে 'পুনশ্চ' কাব্যে রঙের ব্যবহার নানা প্রসঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩০১.২.৬.২ : বাস্তবোচিত বর্ণনার কৌশল

কবিতা কল্পনাধর্মী হলেও কল্পনার পাখায় ভর করে চললে তার চলে না। যদি না সেই কল্পনার জগতের সাথে বাস্তব জগতের সাযুজ্য না থাকে। তবে বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কল্পনার আবশ্যকতা রয়েছে।

আর সেই বিষয়বস্তু যেন বাস্তব বর্জিত না হয়। অবশ্যই তাকে হতে হবে মানব জীবনেরই ঘটমান জীবনের কথা, যাপনের কথা। যদি তা না হয় তবে কবিতা বা কাব্যটি বাস্তবশূন্য জীবনহীনের কথাকে ফুটিয়ে তুলবে, যা কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চ'(১৩৩৯) কাব্যে মানুষের জীবনযাপনের সার্বিক চিত্রটিকে গল্পবলার ছলে সহজ সরল ভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও পরিত্যক্ত হয়নি। আসলে কবিতাকে ছন্দের বন্ধন, ভাষা বাহুল্য থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীকে আমরা যেভাবে দেখি ঠিক সেইভাবেই কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এযেন এক ভিন্নভাব, ভিন্নমাত্রা দান- যা বলার কৌশলই আলাদা। যেমন- 'বাঁশি' (আষাঢ় ১৩৩৯) কবিতায় হরিপদ কেরানীর জীবনবৃত্তান্তকে তুলে ধরেছেন এভাবে -

"বর্ষা ঘনঘোর
ট্রামের খরচা বাড়ে
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কানকো।

অন্ধকারময় এক গলির মধ্যে বাস করেও হরিপদ কেরানী অতীতের ফেলে আসা ধলেশ্বরী নদীরপারের সুখস্মৃতির কথা ভুলে যায় না। আবার বাঁশির সুরে তার মন অনন্তের দিকে ধাবিত হয়। এই যে বাস্তবের বর্ণনার পাশাপাশি বাস্তবকে অস্বীকার না করে অতীত ও ভবিষ্যৎকে একাকার করে তোলা এই কবিতায়। যার ফলে এক অনির্বাচনীয় আস্বাদ অনুভূত হয় কবিতার অভ্যন্তরে।

'ছেলেটা'(শ্রাবণ, ১৩৩৯) কবিতায় বছর দশেকের এক বালকের জীবনবৃত্তান্ত অসাধারণ ভাবে বর্ণিত। যা কেবল অবহেলার মধ্য দিয়ে দিয়েই বেঁচে উঠেছে আগাছার মতো। যেখানে মালির কোনো যত্নের বালাই নেই। তার জীবন চিত্র একেবারে ডানপিটে গ্রাম্য বর্বর বালকদের মতো, যাকে বশ করা খুবই কঠিন। কারণ সে কারো পরোয়া করে না। যে কুল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়, বুনো ফল খেয়ে ভির্মি লেগে বেঁচে ওঠে। নদীতে ডুবে গিয়ে ফিরে আসে। পোষা কুকুর, পোকামাকড়, ব্যাঙ নিয়ে তার রাজ্য।তার পোষা কুকুরের মৃত্যুতে দুঃখের অনুভূতি যেন সকলের হয়ে উঠেছে।

"একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটলো।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনদিন জল বেরোয়নি যে ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াল;"

এই বর্ণনা সত্যিই মর্মস্পর্শী যা আমাদের মনের ভিতরেও নাড়া দিয়ে যায়। যে ছেলের কথা সাহিত্যের কোথাও বর্ণিত হতে পারে না তাকে কাব্যের অন্তরে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

তার সমস্ত দৌরাত্মি সিধু গয়লানীর উপর। সিধু গয়লানী মাসির বাধা গরুর দড়ি কেটে দেয়, খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে, আর ভাঁড় রাখে লুকিয়ে। কিন্তু ছেলেটার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ প্রকাশিত হয়,

কেউ ছেলেটাকে শাসন করতে এলে সে পক্ষ নেয় ছেলেটারই। ওর বয়সি একটি ছেলে ছিল তার, যে মারা গেছে সাত বছর আগে। এইসব চরিত্র এর আগে রবীন্দ্র কবিতায় আসেনি। তাই পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে ছেলেটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে 'শেষ চিঠি'(শ্রাবণ ১৩৩৯) কবিতায় মাতৃহারা এক কন্যার পিতার প্রতি স্নেহ অভিমান ও বিয়োগ ব্যথা নিয়ে কিভাবে না ফেরার দেশে চলে গেল তার দুঃখজনক কথা কাহিনী কবি পিতৃহৃদয়ের বিষাদঘন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। অমলিকে তার পিতা নিজের থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে পিতার কাছেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তার থাকা হয়নি। পিতা ফিরে এসে দেখলেন-

"চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেন অমলিকে দেখতে কাশীতে।
পথের মধ্যে পেলাম চিঠি-
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছি।"

কন্যাহারা এক পিতার দুঃখের বর্ণনা যেন সমগ্র সংসারের দুঃখে পরিণত হয়েছে। যার বর্ণনায় কবি সহজ সরল ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মেয়ের সাথে বিজড়িত নিত্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে মেয়ের স্মৃতি, যা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে একে একে পূর্বের কথা। আর রয়েছে অভিমানে ভরা একটি চিঠিও- 'তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে'। মেয়ের এই আবদার রক্ষা করতে পারেনি পিতা। চিঠি পৌঁছোয়নি তাঁর কাছে। চিরকালের জন্য হারিয়েছেন তাকে। পুনশ্চের বেশিরভাগ কবিতার অন্দরে বাস্তবের বিষয়কে কেন্দ্র করে মানব সংসারের সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাকে বিশেষ কবিত্বের সহিত তুলে ধরেছেন। যার প্রতিটি বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। যাতে রয়েছে না পাওয়ার যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের বেদনা এবং হৃদয়ভরা অভিমান, অনুরাগ ইত্যাদি।

৩০১.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পুনশ্চ' কাব্যে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার অভিমত নিজের ভাষায় লেখো।

২। 'পুনশ্চ' কাব্যের বিষয় বর্ণনার কৌশল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

একক ৭

পুনশ্চ - নতুন কালের পদধ্বনি

বিন্যাস ক্রম

৩০১.২.৭.১ : পুনশ্চ - নতুন কালের পদধ্বনি

৩০১.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৭.১ : পুনশ্চ - নতুন কালের পদধ্বনি

'পুনশ্চ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু, কাব্য-কাঠামো, ছন্দ, শৈলী সার্বিক বিষয়েই নতুনত্বের আস্বাদ রয়েছে। সব বলার পরও যখন আরও রয়ে যায় বাকি তখন তা 'পুনশ্চ'র শেষ পরিচ্ছেদে ভেসে ওঠে। যেখানে অনেক অনাগত ভাবনাকে ব্যক্ত করা হয়। যা আগেই বলা দরকার ছিল অথচ বলা হয়নি, কোনো কারণবশত "পুনশ্চ" সেই কথাই বলে ; 'পরিশেষে'র পরের কথা। এই কাব্যে কবিতায় যে নতুনের পদধব্বনিকে ধ্বনিত করে তুলেছে, তা একাধিক কবিতা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি। "নূতন কাল" (ভাদ্র ১৩৩৯) কবিতায় সেই ভাবটিই ব্যক্ত করে তুলছে। কবি তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের সকল সৃষ্টিগুলিকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যার মূল্য সবাই সঠিকভাবে দেয়নি। যা সবাই ভুলে গেল, রইলো কেবল স্মৃতির পাতায়। সেই পুরনো ভাবনা যে আর চলবে না তা কবি বুঝেছিলেন অনেক আগে। তাই নতুনকে বরণ করে নিয়েছিলেন মনে মনে। কবি বলেছেন-

"দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই
তখন দেখি তুমি যে আছ
একালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।"

কবি কাব্যলক্ষ্মীকে নতুন কালের আঙিনায় এসে বরণ করে নিলেন। যে পাঠকরা একদিন তাকে অবহেলা, সমালোচনা করেছিলেন, তারাই বুঝবেন যে সেকালে তাঁর প্রয়োজন কতটা ছিল, একালেই বা কতটা। কিন্তু যারা কবির প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা রেখেছেন; কবি সেই কাব্যলক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার এলেন, নতুনের গান গাইলেন নবরুপে।

"তাই ফিরে আসতে হল আর-একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।"

এই নতুনকালকে কবি নিজেও বরণ করেছেন যাতে সবাই তাকে নিজেদেরই লোক মনে করে। কিন্তু নতুন দিকে ধাবিত হয়ে পুরাতন কবিকে বিদায়জানিয়ে ব্যথিত মনে 'যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে' সেখানে একালের কবি এসে দাঁড়ান। তবে নতুন স্রোতে গা ভাসাতে ভাসাতে দিশেহারা হয়ে যান যেন কবি। তবুও তিনি চলেছেন এগিয়ে- সাথে রয়েছে পুরাতন ও নূতনের যৌথ পদধ্বনি।

অন্যদিকে 'ক্যামেলিয়া' কবিতার মধ্যেও নূতনের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। ক্যামেলিয়া ফুলকে কবি কবিতার শেষে কারো হাতে বা টবে স্থান দিলেন না, দিলেন সাঁওতাল মেয়ের কানে-

"বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।"

যে প্রেমের শুরু শহুরে জীবনের মধ্য থেকে হয়েছিল তার পরিণতি ঘটল গ্রাম জীবনের সাঁওতাল পরগণায়। যেখানে সহজসরল শান্ত জীবনকেই প্রকাশ পায়। জীবনের জটিল যন্ত্রণা, শহুরে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা গ্রামে স্পর্শ করেনি। তাই পরিসমাপ্তিতে গ্রামের কথা। যে প্রেম শহরে অবহেলিত তা গ্রামে এসে পরিণত হল। যে ক্যামেলিয়া কমলার হাতে অসুন্দর তা সাঁওতাল মেয়ের কানে আলো করে তুলেছে। এভাবেই কবিতাটি ভিন্নভাবনাকে ব্যক্ত করে তুলেছে।

'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় সাধারণ মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের কথাতেও নতুনত্বের আস্বাদ পাই। যেখানে নারী জীবনের পরিবর্তিত জীবনকাহিনীর কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন তাতেও ভাবনা পরিবর্তনের ছোঁয়া রয়েছে। মালতী হবে বিশ্ববিজয়ী। "মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না,/বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।" এতদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে জয়গাথা গেয়ে আসছিলেন সবাই আজ তা নারীদের সম্মানার্থে গাওয়া হোক। এভাবনাও ব্যতিক্রমী, রবীন্দ্রনাথ মালতীদের সেভাবেই সাজিয়ে তুলতে চান। নারী আর পুরুষের পদদলিত, অবহেলিত নয়, কেবল তাদের দাসত্ব পালন করতে জন্মগ্রহণ করেনি। নারীর আসল পরিচয় যে মানুষ, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে। তাইতো 'সাধারণ মেয়ে' বলেছে- "মালতীকে সবাই চিনুক, শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।" তার নারীত্বটাই আসল পরিচয় হয়ে উঠুক, এটাই শেষ কথা। পুনশ্চের এখানেও নারী ভাবনায় নতুনত্বের দাবি রাখে।

৩০১.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পুনশ্চ' কাব্য 'পুরাতন ও নূতনের যৌথ পদধ্বনি'—বিশ্লেষণ করো।

একক ৮

পুনশ্চ- অন্ত্যজ জীবনের কাহিনী

বিন্যাস ক্রম

৩০১.২.৮.১ : পুনশ্চ - অন্ত্যজ জীবনের কাহিনী

৩০১.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৮.১ : পুনশ্চ - অন্ত্যজ জীবনের কাহিনী

রবীন্দ্র সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনকথা তেমনভাবে গ্রহণ হয়নি। সেখানে রাজরাজড়ার কাহিনী,অভিজাত শ্রেণীর জীবনবৈচিত্র্য প্রধান স্থান দখল করেছিল।কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজের অস্পৃশ্য পিছিয়ে পড়া মানুষজনদের নিয়ে অনেক কাহিনীধারা বর্ণিত হয়েছে।'পুনশ্চ'(১৩৩৯)তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ,যেখানে একাধিক কবিতায় এই অন্ত্যজদের জীবনকাহিনীকে বর্ণনা করেছেন। মানুষের মধ্যকার বিভেদ,আশুচিতাকে দূর করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন কবি। যাদের ছাড়া সমাজে সার্বিক মঙ্গলকর্ম অপূর্ণ আসছিল,তাদের স্পর্শ যেন পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটল। যেমন-প্রথমপূজা,প্রেমের সোনা,স্নানসমাপন, শুচি,মুক্তি প্রভৃতি কবিতা।

'প্রথমপূজা'র(শ্রাবণ,১৩৩৯)কাহিনী সেই অস্পৃশ্য কিরাত জাতির কথায় বিধৃত।যারা একদা ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরকে গড়ে তুলেছিল, স্বয়ং বিশ্বকর্মা যার ভিতপতন করেছিল,হনুমান বহন করেছিল পাথর।আজ যুগের পরিবর্তনে সেই মন্দিরে কিরাত জাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ।ভগবানের রাজ্যে কোন বাধা না থাকলেও মানুষের সৃষ্ট রাজ্যে রয়েছে। তাই তারা সমাজচ্যুত

"কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত,আজ তার মন্দির নেই,তার গান আছে।"

মন্দিরের পূজা দিয়ে স্বয়ং মহারাজ যখন আসে তখন দেখে মন্দিরের প্রাচীর ধুলিস্যাৎ।আবার ডাক পড়ল কিরাত দলপতি মাধবের, সংস্কার করার জন্য। শর্ত দিল চোখ বন্ধ করে সংস্কার করতে হবে।তাতেই রাজি হল মাধব।একাদশীতে প্রথম পূজা হবে।কাজ শেষে মাধব দেবতাকে দেখতে লাগল - দেবতার চোখে জল।এই অপরাধে রাজা মাধবের মুণ্ডু ছেদ করলেন।মাধবের রক্তে দেবতার প্রথম পূজা হল সমাপন।

'প্রেমের সোনা' (পৌষ, ১৩৩৯) কবিতাটিতে রবিদাস চামারের কথা রয়েছে। যে রাজপথ ঝাট দেয়। সকলের কাছে সে অস্পৃশ্য। সকলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে। রামানন্দ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রেম দান করলো। এতে রবিদাস প্রাণোচ্ছল হয়ে গান গেয়ে উঠলো। যা চিতোরের রানী ঝালির মনকে উদাস করে তোলে। রানী রবিদাস চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিল। ক্ষুব্ধ রাজপুরোহিত ধিক্কার দিল রানীকে। বলল—

"ধিক, মহারানী,ধিক!
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু বলে
ব্রাহ্মণের হেট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার।"

সমাজের সকল বিভেদ দূর হয়ে গেল রামানন্দ-রবিদাস-রানীর সৌহার্দ্য মিলনে। 'স্নানসমাপন'এ (ফাল্গুন, ১৩৪৯) রামানন্দ শিষ্যদের নিয়ে স্নানে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই গঙ্গার সঙ্গে তার হৃদয়ের মিলনসম্পন্ন হচ্ছে না। স্নান রয়ে গেল অপূর্ণ;দেহ অশুচি রইল। অবশেষে বালুচরের প্রান্তে গ্রামের ভজন মুচির গৃহে গিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করে রামানন্দ তার দেহকে পবিত্র করল। শিষ্যরা দেখে অবাক হলেন। ভজনও প্রণাম করে বলল—

"কি করলেন প্রভু
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।"

রামানান্দ দেখল যে অশুচি দূর না হলে বাইরে দেহের শুচি অসম্ভব, তার জন্যই ভজনকে আপন করে নিল, যার ফলে তার পূজা সমাপ্ত হল যা তাকে 'মন্দিরে আর হবে না যেতে'।

'শুচি'(অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)কবিতায়রামানন্দ মন্দিরের গুরু। পূজা দিয়ে নৈবেদ্য খেয়ে তার দিন কাটে। রাজা রানী পূজা দিতে এলে অস্পৃশ্যদের মন্দির থেকে দূর করে দেওয়া হয়।এতে দেবতা ক্ষুন্ন হন, দেবতা আর নৈবেদ্য গ্রহণ করেননি—

"তাদের অপমান আমাকে বেজেছে;
আজ তোমার হাতে নৈবেদ্য অশুচি।"

ঈশ্বর যে সেই অস্পৃশ্যদের মধ্যেও আছে তাই বললেন ঠাকুর। ভারাক্রান্ত মনে রামানন্দ ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল হলে একাই পথে বের হলেন। নদীর ঘাটে শ্মশানে নাভা চন্ডাল কে দেখলেন, তাকে জড়িয়ে ধরে অন্তরে মৃতভাবকে সৎকার করলেন। তারপর ভোরের দিকে কবিরের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে বলল—'প্রভু জাতিতে আমি মুসলমান,/আমি জোলা, নিচ আমার বৃত্তি।' রামানন্দ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

"চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।"

অন্তরের পাপবোধ থেকে এভাবেই রামানন্দের মুক্তি ঘটলো। আর 'মুক্তি' (মাঘ, ১৩৩৯) কবিতায় বাজিরাও পেশোয়া কীর্তনীর সাথে মন্দির থেকে উধাও হলেন। মন্দিরে তার অভিষেক ছিল। সবার স্থান হল। কিন্তু কীর্তনী রইল মন্দির প্রাসাদের বাইরে। কীর্তনী জানত দেবতাকে পাথরে আটকে রাখা সম্ভব নয়, তবু সে দূর থেকে একা একা গান গাইতে লাগলো। অবশেষে প্রভাত হল—

"রাজবাড়ির ঠাকুর ঘর শূন্য
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপাচার পড়ে আছে-
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চল
পথের পথিক হয়ে।"

দেবতা হয়ে উঠলেন পথের দেবতা। যাকে তার থেকে দূরে রাখা হলো, সেই তারই সাথে দেবতা মন্দির থেকে বিদায় নিলেন - মুক্তি ঘটলো সকল জাতিগত বন্ধনের। এভাবে কাব্যের একাধিক কবিতায় অন্ত্যজদের কাহিনী তুলে ধরে মানুষের মধ্যেকার বিভেদকে দূর করে বিশ্লেষণ করেছেন। পুনশ্চ তাই অতিকথন নয়, পুনরুক্তি নয়, তা কবির হৃদয়ের অন্তরের বাণী।

৩০১.২.৮.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি অন্ত্যজ শ্রেণির হৃদয়-কথনকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন, তা আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ: ৩

একক-৯

'ফাল্গুনী'-র সমসাময়িক রচনা ও কাহিনি

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৩.৯.১ ভূমিকা

৩০১.৩.৯.২ নাটকের কাহিনি

৩০১.৩.৯.৩ ফাল্গুনী : সমসায়িক রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রমনন

৩০১.৩.৯.৪ উপসংহার

৩০১.৩.৯.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.৯.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৩০১.৩.৯.১ ভূমিকা

'ফাল্গুনী' নাটকটি প্রথম পকাশিত হয় 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় চৈত্র, ১৩২১ দ্বাদশ সংখ্যায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের (ইং ১৯১৬) ফাল্গুন মাসে। এই সময়ের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আছেন সঙ্গে তিন শিল্পী নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল চন্দ্র দে। শিলাইদহ থেকে ফিরে কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে ১০ই ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে আসেন। এসেই কবি একেবারে সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) চলে যান। সেখানে কবি শান্ত নির্জনতায় বসে 'ফাল্গুনী' নাটকটি রচনা শেষ করেন ২০ ফাল্গুন, ১৩২১ বঙ্গাব্দে। সেইদিন আশ্রমে এই নাটকটি কবি আশ্রমবাসীদের কাছে পাঠ করেন। আশ্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে আশ্রমের কাজকর্ম রীতিনীতি জাতি পংক্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের অশান্তি চলছিল তখন। কবি সেইসময় এইসব নিয়ে একটু বিরক্ত ও বিমর্ষ ছিলেন। নানান বিষয়ে তর্কবিতর্কের অবকাশ তৈরি হলে তিনি কিছুটা অশান্তির মধ্যেই ছিলেন।

সেই পর্বে কবি জীবনের মধ্যে তিনি একটি সংকট অনুভব করছেন। জীবনের সত্য উদ্ঘাটন করতে গেলে সংকট থাকা খুব জরুরি। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২২ সংখ্যায় 'শহরে ফাল্গুন' নামে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ফাল্গুনী দু'টি নাটকের সমষ্টি, 'এক বহিঃপ্রকৃতির, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতির।' একদিকে বহিঃপ্রকৃতিতে যখন নানান সমস্যা ঘটে চলেছে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুই প্রকৃতির সংযোগসাধনের অপূর্ব সম্মিলন এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। একদিকে বৃদ্ধ শীত চলে যেতে চাইছে, নব বসন্তের নতুন প্রাণের চরেরা তাকে বলছে "যাবে কি? তোমাকে যে আমাদের খেলার সাথী হ'তে হবে !" ১৮ মাঘ, ১৩২১ সালে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে পত্র লিখছেন, "You are right– I had been suffering from a time of deep depression and weariness. But I am save and sound again– and willing to live another hundred years– if critics would spare me.।" এই কথাই যেন নাটকে ব্যক্ত হয়েছে মহারাজের মধ্যে দিয়ে।

অভিনয়ের দিকটি দেখলে বোঝা যায়, এই নাটকটি কবির কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! প্রথম 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় হয় বিদ্বজ্জন সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে ১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। কবির বয়স তখন কুড়ির ঘরে। বাল্মীকির চরিত্রে তিনি স্বয়ং অভিনয় করেন। তারপর থেকে 'রাজা ও রাণী' (অভিনয়ের কাল-১৮৮৯ সাল, এবং রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন বিক্রমদেব), 'বিসর্জন' (অভিনয়ের কাল- ১৮৯০, রবীন্দ্রনাথ-রঘুপতি), বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭, রবীন্দ্রনাথ- কেদার এবং গগনেন্দ্রনাথ) এবং 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে ১৯১৫ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে। কালিদাস নাগ অবশ্য বলেন ২৫ এপ্রিলের কথা। যাই হোক, নাটকটির অভিনয় নিয়ে গুরুদেব ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। নাটকটিকে দর্শকরা কেমনভাবে গ্রহণ করবে এই বিষয়টিকে নিয়েই তিনি বেশি ভাবতেন। কারণ ফাল্গুনী প্রচলিত ধারার নাটকের থেকে অনেকাংশেই পৃথক। নাট্যঘরে প্রস্তুতির সময় তিনি সেজেছিলেন অন্ধ বাউল। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করেন, নাটকটি শুরু হবার পূর্বে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা তিনি বলবেন এবং পরে সেই প্রয়োজনের কথা থেকে নতুন একটি অংশ যুক্ত করে দেন। এর থেকেই তিনি পরে 'বৈরাগ্যসাধন' অংশটি যুক্ত করার কথা ভাবেন। সেখানে রাজার মন খারাপ এবং শ্রুতিভূষণ চরিত্রের কথা ও পরে কবিশেখর এসে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেয়। এর দ্বিতীয় অভিনয় হয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় এবার নতুন করে যুক্ত হল 'বৈরাগ্যসাধন'। অর্থাৎ মূল নাটকে প্রবেশে পূর্বে একটি নির্দেশক অংশ। এবারের অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৩২২ সালে বাঁকুড়া জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করা এবং নিরন্ন জনসাধারণের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা।

অসিত কুমার হালদার 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে বলেছেন,'রবিদার নিজের অভিনয় ক্ষমতা অপূর্ব ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্ব, দেহের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, আর তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্য্য অভিনয় করার রীতি দেখে সকলেরই প্রীতির উদ্রেক হতো। সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর দিকে স্টেজে চেয়ে থাকতেন। আমার মনে হয় কোনো অপূর্ব সুন্দরীর প্রতিও এত আকৃষ্ট কেউ হতে পারতো না। এরূপ দিব্য দর্শন পুরুষের অভিনয় ভাগ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।' যখন কোনো নাট্যকার নাটক রচনা করে নিজেই সেই নাটকে অভিনয় করেন তখন সেই নাটকটি(বইটি) পুনরায় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে রচিত বা সৃষ্ট হতে থাকে। নতুন টেক্সটরূপে পুনরায় আমরা তাকে পেয়ে থাকি। নাটক রচনা একটি শিল্প; আর নাটকে অভিনয় করে কাহিনিকে উপস্থাপন করা ভিন্ন শিল্প। এই দুই শিল্পের যুগপৎ সম্মিলনে নাট্য অংশটির এক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। সেটি তখন আর জড় পদার্থ নয়; তখন সে হয়ে ওঠে সজীব ও প্রাণবন্ত। আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নাট্যরচনা শুধুই একটি ক্রিয়া নয়, বিনোদন নয়, সৃষ্টি নয়তা শিক্ষাদানের একটি উপায়। সেক্ষেত্রে উপেয় হয়ে ওঠে নাটকগুলি। এই ভাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাই রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি ব্যাপকরূপ লাভ করে। যার মধ্যে পড়া আছে তার মধ্যেই শিক্ষাদানের সূত্র আছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের একটি বহুচর্চিত বিষয় 'মানবজীবনের মধ্যপর্বের সমস্যা'। এই সময় মানুষের প্রৌঢ়ত্বের দিকটি তাকে ভাবিয়ে তোলে। তার উপর কানের পাশে চুলে পাক ধরলে মৃত্যুর হাতছানি মনে করে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে ও শেষে তাই ফেলে আসা যৌবনের প্রতি মানুষের মন খারাপের অন্ত থাকে না। এই কথা 'ফাল্গুনী' নাটকে আলোচিত বিষয়। অন্তঃপ্রকৃতিতে যে লীলা চলছে প্রকৃতির বুকে ঋতুর পর ঋতুর খেলা চলেছে অবিরত। এক ঋতু আসে আবার চলে যায়, আর এক এসে উপস্থিত হয়। এমনি করে ঋতুর পর ঋতুর নিরন্তর খেলা চলছে বিশ্বপ্রকৃতিতে। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে যখন পটপরিবর্তন হয় তখন আমাদের মধ্যেও সেই লীলা ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে। আমাদের সম্মুখভাগে প্রকৃতি যে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়; আমাদের প্রকৃতি-সম্পৃক্ত মন সেখানে ধরা দেয় তার মতো করেই। যা আবার ধরা দেয় বিশ্বচরাচরের লীলায়, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে, আমাদের চিত্তপটে যেন অপূর্ব জ্ঞানানুশীলনের দৃশ্য।

৩০১.৩.৯.২ নাটকের কাহিনি

শুরুতেই নাটকের কাহিনির দিকটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই নাটকে যে গল্পটি আছে তা যতই গভীর হোক না কেন, তার আয়োজনটি খুবই হালকা তা বলাই বাহুল্য। এখানে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থিত হবার আহ্বান আছে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজার ভারী মন খারাপ কারণ গতরাত্রে রাজমহিষী রাজকণ্ঠে মল্লিকার মালা পরাতে গিয়ে দেখতে পান, কানের কাছে দু'টি চুলে পাক ধরেছে তার যৌবন বিগত। মহারাজ বুঝতে পারেন মৃত্যুডঙ্কা বেজে উঠলো বলেই এমন বার্তা দিয়ে যমরাজ সরাসরি কানের কাছে এইভাবে নিমন্ত্রণ পত্র ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ সেই কারণে চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বৈদেশিক দূতের আপ্যায়ন থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের প্রতি মহারাজের কোনো মনোযোগ নেই। সমস্ত কাজ ফেলে শ্রুতিভূষণের সহায়তায় বৈরাগ্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। এই শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যবারিধি'র কথা বলে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থরক্ষার তাগিদে রাজাকে অবসাদের মধ্যে ঠেলে দিতে চান। এমন সময় কবি সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে জীবনের প্রকৃত পাঠ প্রদান করেন। হৃতপ্রায় যৌবনকে খুঁজে পাওয়া যায়; নবকর্মোদ্যমের মধ্যে দিয়েই। কবি রাজাকে বলেন, 'কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।...সাদার প্রাণের মধ্যেই সব রঙের বাসা।' যৌবনের বৈরাগী দলের সঙ্গী হয়ে প্রাণের সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে বলেন। সংসারবিমুখতার সঙ্গে বৈরাগ্যের যোগ নেই। সংসারের পথটাই বৈরাগ্যের পথ,'সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।' যদি বাঁচতেই হয় তো বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে। এই কথা শুনে রাজার মনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। কবি মহারাজের চৈতন্যলোকে অনুভব করাতে সক্ষম হলেন যে, মৃত্যুভয়ে ভীত নয় তাকে জয় করতে হয়। সেই অবস্থান থেকে মহারাজের প্রাণটিকে সজাগ করে রাখতেই 'ফাল্গুনী'র মতো নাটকের উপস্থাপন। প্রাণের অস্তিত্ব যেমন সবসময় বলে চলেছে 'আমি আছি।' 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে একটি প্রাণের সাড়া।'

কবিশেখর একটি নাটক উপস্থাপন করেন যেখানে নবযৌবনের দল খুঁজতে চলেছে দীর্ঘদিনের অর্থাৎ সেই মান্ধাতার আমলের বুড়োকে। যাকে সকলেই ভয় পায়, সেই বুড়োকে খুঁজে ফেরে নবযৌবনের দল। মূল নাটকে দেখানো হয়েছে বাইরে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যেও একই যৌবনলীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বুকে ঘটে চলা আনন্দঘন লীলা অনুভব করলো একদল যুবক। তারা যুক্তিতর্কের দ্বারা ধীর-স্থির বুদ্ধির অধিকারী দাদাকেও পথে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করলো। এমনকি যুবকদলের কোলাহল শুনে সর্দার বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। চন্দ্রহাস তাদের নেতা। যুবকদলেরা সকলে যখন বসন্তের ছুটিতে কী খেলা হবে সেই ভাবনায় ব্যস্ত; তখন সর্দার এসেই বালকদলের মধ্যে একটি খেলার আয়োজন করে বসেন। 'সেই- যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।' যার কথা পুথিতে লেখা থাকে, সকলেই তাকে ভয় পায়; যার কথা সবাই বলেএই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে যার বাসা সেই বুড়োটাকেই ধরে আনার ভার দেয় সর্দার। সর্দার যুবকদলকে পথ বের করে দিয়েই নিজে সেই পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। চন্দ্রহাস কথা দেয় দোলপূর্ণিমার দিনে সেই বুড়োকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে সর্দারের কাছে উপস্থিত করবে।

বুড়োর সন্ধানে গিয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলে মাঝি বলে 'আমি পথের খবর জানি, ও [কোটাল] পথিকের খবর জানে।' রবীন্দ্রনাটকে মাঝির মতো এমন উপেক্ষিত চরিত্রও মহান হয়ে ওঠে এইভাবে—'আমার

দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।' কোটাল যুবকদলের সঙ্গে কথা বলে তাদের বদ্ধ পাগল বলেই উপলব্ধি করে। অবশেষে পথে চলতে চলতে এক অন্ধ বাউলের সন্ধান তারা পায়। সে কাজটা সমস্ত দেহ, মন ও প্রাণ দিয়ে করে তাই তা পরিপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মযোগের কথা শুনিয়েছিলেন পরমপ্রিয় অর্জুনকে। অন্ধকারকে সে ভয় করে না। গান গেয়ে পথ চলে সে যুবদলকে পথ দেখাতে থাকে। একসময় অন্ধকার গুহার মধ্যে চন্দ্রহাস প্রবেশ করে সেই বুড়োকে ধরতে। বাইরে যুবকদলের বাকিদের মনে ভয়ের সঞ্চার হতে থাকে। তারা তখন বাউলের সাহায্যে পথ চলতে চায়। কারণ পথ চলার মধ্যেই আনন্দ, থেমে থাকলেই কুলক্ষণ দেখা দেয়। চন্দ্রহাস অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই বুড়োর খোঁজে।

অবশেষে সর্দার সেই অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। সেই জরা-বৃদ্ধ আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্দার।এই সত্য উন্মোচিত হয়—পিছন থেকে দেখলে যাকে বৃদ্ধ বলে মনে হয়, মনে হয় জরা মৃত্যু সামনে থেকে দেখলে আসলে সে-ই যৌবন। যখন সে বাইরে থাকে তখন তাকে মানুষ নানাভাবে নানান রূপে কল্পনা করে; কিন্তু যখন সে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাকেই বালকের মতো মনে হয় 'এ তো আশ্চর্য্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম !' নবযৌবনের দলের প্রেরণা সর্দার; যিনি আবার কিনা শীতবুড়ো স্বয়ং। জরার মধ্যে দিয়ে যৌবনকে খুঁজে পাওয়া ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই প্রাণকে ফিরে পাওয়া সম্ভব! এই পথের সন্ধান দিতেই সর্দারের এমন আচরণ। জীবনের অন্ধকারময় দিকের কথা শ্রুতিভূষণের কথায় উঠে এসেছে; তেমনি কবিশেখর এসে রাজাকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুললেন।

৩০১.৩.৯.৩ ফাল্গুনী :সমসায়িক রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রমনন

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন 'শিল্পসৃষ্টির সময়েও শিল্পীর মধ্যে এমন এক ঐশী শক্তির আবির্ভাব ঘটে যে, বামন-পুরাণ বলেন—শিল্প-রচনাকালে শিল্পীর হস্তে পরম পবিত্র এক স্বর্গীয়তা অবতীর্ণ হয়...।' বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি যদি সত্য হয় তাহলে বাস্তবের সৃষ্টিকে আমাদের মেনে নিতে হয়। ক্ষিতিমোহন সেন আরও বলেন রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের দেশের সাধকেরা বারবার গতি ও মুক্তিকে যুক্ত করেই দেখেচেন। ...তাছাড়া মৃত্যুও একটা বিরাট মুক্তির দ্বার। এই কথা আমি বার বার বলেচি। যাকে সবাই বদ্ধ করে রাখতে চায় তাকেও মৃত্যু এসে অন্তত একদিন মুক্ত করে দেবেই।" প্রতিনিয়ত তিনি অনুভব করেছেন কেউ বা কোনো কিছুই স্থির নয়; সব কিছু ক্রমাগত চলছে। 'ফাল্গুনী' নাটকটি এই পর্বে কবি রচনা করেন। একদিকে বলাকার গতিরাগের কথা বলছেন অন্যদিকে যৌবনদলের জয়গান গেয়েছেন নাটকের মধ্যে দিয়ে। তিনি চিরকাল গতির উপাসক ছিলেন। তাই গতিকে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি।

রবীন্দ্রনাথের মন ও সৃষ্টি এইসময় কেমন ছিল? সৃষ্টির দিকে তাকালে দেখা যায়—

১৯১২ সালে 'ডাকঘর', 'ধর্মের অধিকার' (প্রবন্ধ), ছোটগল্প, 'আত্মজীবনী', 'ছিন্নপত্র', 'অচলায়তন' নাটক ১৯১৮ সালে 'গুরু'। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৪ সালে অচলায়তন অভিনীত হচ্ছে। এই সময় প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র প্রকাশিত হয়—যেখানে কবি নবপ্রাণ ও নবশক্তির জয়গান ঘোষণা করলেন। ১৯১৪ সালে 'স্মরণ' (কবিতা), 'উৎসর্গ' (কবিতা), 'গীতিমাল্য' (কবিতা ও গান), 'গীতালি' (ঐ), 'ধর্মসঙ্গীত' প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে 'শান্তিনিকেতন'। ১৯১৬ সালে 'শান্তিনিকেতন' (১৫শ, ১৬শ, ১৭শ), 'ফাল্গুনী', 'ঘরে বাইরে' (উপন্যাস), 'সঞ্চয়', 'পরিচয়' (প্রবন্ধ), 'বলাকা' (কাব্য), 'চতুরঙ্গ' (উপন্যাস), 'গল্পশতক'।

১৯১৪ থেকে ১৯১৬ এই দু'বছর ধরে 'বলাকা'র কবিতাগুলি রচিত হয়। যদিও বলাকা ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।

'ফাল্গুনী' কবির একটি বিশেষ পর্বের রচনা; অর্থাৎ আমরা যাকে 'বলাকা'র পর্ব হিসেবেই জানি। এই সময় কবির মন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্দিষ্ট দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ভাবনা এই পর্বের কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সময় কবি 'সৃষ্টির গতিতত্ত্ব' ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিলেন। গতি আছে আমরা বেঁচে আছি, এমনকি পৃথিবীও সচল আছে। এই গতিরাগ প্রাণশক্তির প্রতীক, যৌবনের প্রতীক। আমাদের জীবনে এই শক্তি সমস্ত জরা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে দেয়। সৃষ্টি করে নতুন প্রাণশক্তির আবেগ।

'বলাকা' কাব্যের 'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—"মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। ('ফাল্গুনী'-তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' বলাকা'র সমসাময়িক।) সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ (Form) যদি স্থবির হয়, fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবে সেই অচলরূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল, তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরমা অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।"

মনন

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটক রচনা শুরু হয় ১৯০৮ সাল থেকে 'শারদোৎসব' থেকেই। তারপর 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটক, অর্থাৎ মাঝে আট বছর—এই সময়ের মধ্যে তিনটি নাটক 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন'(১৯১২)।১৮৮৪ সালে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ প্রকৃতির কথা থাকলেও ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে; কিন্তু শারদোৎসব ও ফাল্গুনী-তে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সংঘাত নেই। প্রকৃতিকে সামনে রেখে মানবজীবনের গভীর তত্ত্বকথাকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

'চিঠিপত্র'-এর একাদশ খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে এই কথা বলেছিলেন—'তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি মনে খুব বেদনা বোধ করচি। তার কারণ, এক সময় যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখ্‌লে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না।... শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক!'

কালিদাস নাগের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়—কবি রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমার এই নাটিকাটিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি—আমার এখনকার মনের ভাবটি ঠিক বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে আমি যেন আজ কন্যাদায় গ্রস্থ। নিজের লেখার উপর কবির অপত্য স্নেহ স্বাভাবিক। ...আমি আমার কন্যাকে সম্পূর্ণ নিরাভরন করে আপনাদের সামনে এনেছি এবং যেহেতু অলংকার মাঙ্গলিক হিসাবে প্রয়োজন, তখন বরপক্ষ থেকে আপনারাই তা দেবেন। দ্বিতীয় প্রয়োজনটি পূরণ করিনি বললে সত্য হবে না। অর্থ আমি কন্যার সঙ্গে যৌতুক দিয়েছি।' তিনি এই নাটকটিকে নিয়ে ভেবেছেন বিস্তর তার প্রমাণ এই কথাগুলি।

এই নাটকের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ সত্য বলেই গহণ করেছেন। নাটকের মানব চরিত্র গুলি রূপক; কিন্তু এর প্রকৃতি জগৎ প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষলোকের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষলোকের সংমিশ্রণ ঘটতে দেননি। এই জন্যেই প্রকৃতি-লোককে 'ফাল্গুনী'র আলোক-জগতের পটভূমিকায় রক্ষা করা হয়েছে। এই অংশটিই প্রকৃত নাট্যাংশ—একে নাট্যভাগও বলা যেরতে পারে। ফাল্গুনীতে কবির ব্যক্তিগত যৌবন (ভূমিকায় কথিত ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার যৌবন), প্রকৃতির যৌবন (গীতি ভূমিকায় কথিত) এবং মানব সমাজের যৌবন (মূল নাটকে কথিত)এই তিন যৌবনের সমস্যায় জড়িত। কালে কালে নিরন্তর যৌবনের জয় হয়ে চলেছে। 'অচলায়তন'-এ ভিন্ন দেশ থেকে আগত শোণপাংশুর বা যুবশক্তির আঘাতে মুক্তিলাভ হয়। 'তাসের দেশ'-এ ভিন্ন দেশ থেকে আগত রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের আগমনে তাসবংশীয়দের মুক্তি হয়। ফাল্গুনীতে সেই কথা কবিশেখরে মধ্যে দিয়ে কথিত। তাঁর দ্বারা প্রদর্শিত নাট্যজাতীয় কিছু একটির মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম জয় শেষপর্যন্ত যৌবনেরই হল।

৩০১.৩.৯.৪ উপসংহার

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য 'রবীন্দ্র নাট্যধারা' গ্রন্থে বলেছেন ''রবীন্দ্রনাথের নাটক 'ফাল্গুনী' ও কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' শুধু যে সমসাময়িক রচনা তাহাই নহে—উভয়ের মধ্যে একই সমাজ-চৈতন্যের অভিব্যক্তির পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। উভয়ের মধ্যে আমাদের দেশের এতদ্দেশের তামসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ঘোষিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ প্রকৃতির সহায়তায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য বিষয় রূপায়িত করিয়া তুলেছেন।''জীবন ও মৃত্যু আমাদের জীবনের দুটি অবস্থা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবনকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয় এবং মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। মৃত্যুকে মেনে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে গেলেই জীবনের প্রকৃত রস ও আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ফাল্গুনীর যুবকদল সেই কাজটিই করে চলেছে নিরন্তর। বাস্তবিক মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি হিসেবে ধরা হয়; কিন্তু এই বিশ্বচরাচরের সমগ্রকে একসঙ্গে দেখলে আমরা প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি। প্রকৃতিরাজ্য আমাদের এই শিক্ষা প্রতিনিয়ত প্রদান করে চলেছে। শীত অতিক্রান্ত হলেই বসন্তের আগমন। জরা শুষ্কতায় গাছের পাতা ঝড়ে গেলেই বসন্তে তা পুনরায় নতুনরূপে নতুনভাবে নবউদ্যমে গজিয়ে ওঠে। প্রকৃতির রাজ্যে যে লীলার আয়োজন ব্যাবহারিক জীবনেও সেই লীলার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ। মানবজীবনও সেই একইরকমভাবে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নতুন যৌবন লাভ করে।

৩০১.৩.৯.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) 'ফাল্গুনী' নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যলোকের ভাবধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

খ) 'ফাল্গুনী' নাটকে যে কথা তিনি বলতে চেয়েছেন সমসাময়িক কালে আর কোন কোন রচনায় তার কথা আছে। দৃষ্টান্তসহ সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

৩০১.৩.৯.৬ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্র সাগর সংগমে- বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়- শচীন সেন

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা- সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য

রবি-রশ্মি- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একক -১০

ফাল্গুনী নাটক ও শিল্পবিচার

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৩.১০.১ ভূমিকা

৩০১.৩.১০.২ ফাল্গুনী নাটকের গঠনশৈলী

৩০১.৩.১০.৩ উপসংহার

৩০১.৩.১০.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১০.৫ সহায়ক গ্রন্থ

৩০১.৩.১০.১ ভূমিকা

কবি বলেছেন (সবুজপত্র, ১৩২৪, 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধ, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮), 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন থেকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনে পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটাই হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়।' অর্থাৎ নিরাসক্ত যৌবন-শক্তি লাভ করতে গেলে মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করেই যেতে হয়; তাকে পাশ কাটিয়ে নয়-সেই কথা আকারে ইঙ্গিতে আভাসে 'ফাল্গুনী' নাটকে বর্ণিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'ফাল্গুনী' নাটকে 'নূতন ধরণের ছলিক' বলে উল্লেখ করেছেন। ছলিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—'পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছলিক ব'লে একরকম গীতাভিনয় হোত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গূঢ় অভিপ্রায়, অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীদের চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তা'তে কোনও স্থান পেত না। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে—এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।'

নাটকের শুরুতে 'বৈরাগ্যসাধন' অংশে আছে কবিশেখরকে রাজা বলছেন'কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো, একটা যা-হয় কিছু করো, যেমন এই ফাল্গুনে হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনি তরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে ? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক,

কিম্বা ভাণ, কিম্বা...।' কবিশেখর উত্তরে বলেন, আছে কিন্তু সেটা নাটক কি প্রকরণ কি রূপক কি ভাণ তা ঠিক করে বলা যাবে না। এই রচনার অর্থসংগ্রহের কথায় যুক্ত হয়, 'আমি তো বলেছি, আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝাবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' রাজা এই উপস্থাপনের 'তত্ত্বকথা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে কবিশেখর বলেন এখানে তত্ত্বকথা 'কিচ্ছু' নেই। শুধু এই রচনার বক্তব্য হল—'আমি আছি'। কবিশেখরের রচনা সেই সদ্যজাত শিশুর কান্নার মতো, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।' এখানে কোনো প্রস্তুতি নেই, চিত্রপট নেই, কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র বিভাজন নেই; যে যেমনভাবে খুশি অভিনয় করতে পারে। গোটাকয়েক চরিত্র নির্দিষ্ট আছে, আর বাকিদের কথার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। শুধু গানের চাবি দিয়েই এই রচনার এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হচ্ছে। আসল কথাটি হল 'শীতের বস্ত্রহরণ'। প্রকৃতির অখণ্ড রূপের কথা ভাবতে গেলেই চোখে পড়ে চিরনবীন চিরবসন্তের প্রাণপ্রাচুর্য্যময় রূপটির প্রতি। জরা, মৃত্যু, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতিকে জীবন বিছিন্ন করে বা খণ্ড করে বিচার করতে গেলে এক্ষেত্রে চলে না, আবার সামঞ্জস্যও থাকে না। তাই সংযুক্ত করে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, বৃহত্তর মানবজীবনের এক একটি পর্যায়ের উপর অপর পর্যায়ের সৌন্দর্য্য। বহিঃপ্রকৃতির মতো তার কোনও বিরাম নেই। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের জীবনের জরাটা হল পিছনের দিক; আর সামনের দিক হল যৌবনের দিক, প্রাণচাঞ্চল্যের দিক। যা কিছু জীর্ণ, পুরাতন তা নতুনকে সর্বদা তাড়া করে চলেছে। তাই আমাদের স্থিরতা নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই। আছে শুধু নবপ্রাণের নবযৌবন। এই কথাই ফাল্গুনী নাটকের মধ্যে পরিবেশিত হয়।

'ফাল্গুনী'-তে এমনই একটি কাল্পনিক কাঠামো দেখতে পাই। সেখানে অন্ধকার গুহাদ্বার থেকে বেরিয়ে আসে চিরযৌবনের মূর্তমান প্রতীক সর্দার। এখন আমরা দেখে নিতে পারি বার্ধক্যের মধ্যে কবি কীভাবে এই নবযৌবনের লীলাকে বারবার ফিরে ফিরে অনুভব করেন!

৩০১.৩.১০.২ ফাল্গুনী নাটকের গঠনশৈলী

বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ স্বকীয় নাট্যবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ তৎপর ছিলেন। 'ফাল্গুনী' নাটকটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশের সময় 'ভূমিকা'-য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,'আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক 'ফাল্গুনী' বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মত তাহারি মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।' সেই দিক থেকে বিচার করলে এই নাটকের তিনটি অংশ প্রত্যক্ষ করা যায়'সূচনা', 'বসন্তের পালা' ও অবশিষ্ট অংশের নাম 'ফাল্গুনী'। যদিও তিনটি অংশে বিভক্ত তবুও এককথায় তা অখণ্ড বলেই বিবেচ্য। মূল নাটক অবশ্য চৈত্র, ১৩২১ সালে (দ্বাদশ সংখ্যায়) 'বসন্তের পালা' নামে ও একটি 'ভূমিকা' সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে গীতিভূমিকাগুলি ও শেষের গানটি তার সঙ্গে সংযুক্ত করে মূল নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'সূচনা' অংশটি 'বৈরাগ্য সাধন' নামে সবুজপত্র পত্রিকায় মাঘ, ১৩২২ সালে (২য় বর্ষ, দশম সংখ্যা) মুদ্রিত হয়। পরে ফাল্গুন ১৩২২ 'ফাল্গুনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩২২ সালের পৌষের শুরুর দিকে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়। উপার্জনের অর্থ বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবাকল্পে দানের

উদ্দেশ্যে অভিনয় হবে। সেই সময় কলকাতায় পৌঁছে কবি 'বৈরাগ্য সাধন' নামে ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করে ফাল্গুনীর ভূমিকারূপে অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। আমরা জানি এই অংশটি সূচনাও বটে। মূল নাটককে বুঝতে এই অংশের প্রয়োজনীয়তা সবথেকে বেশি। জনমানসের কাছে এই নাটক যাতে দুর্বোধ্য না হয়ে ওঠে সেই কারণেই এই অংশটি সংযোজিত হয়। 'সূচনা'—নাটকের মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে মহারাজের মতো মানুষের মনের অবস্থা উপলব্ধির প্রয়োজনেই এই অংশের অবতারণা। মহারাজের পক্ককেশ নিয়ে চিন্তার কারণেই বৈরাগ্য-সাধনার কথা বা প্রসঙ্গ বারবার এই অংশে ধ্বনিত হয়েছে; তাই এই অংশের নাম বৈরাগ্য-সাধন'। মূল নাটকের সমস্যাপটটিকে বুঝতে এই অংশটির গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

মূল নাটকের দৃশ্য বিভাজনের মধ্যে কবি নতুনত্ব কিছু এনেছেন—প্রত্যেকটি দৃশ্যের শুরুতে একটি করে নাম আছে; যেমন--পথ, সন্ধান, সন্দেহ ও প্রকাশ। 'পথ' অর্থে আমাদের চৈতন্যলোক, জীবনের প্রকৃত মানে সন্ধান করতে গেলেই সন্দেহ জন্মায় সংশয় জন্মায় এবং প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা আলোকিত ও মুক্ত জগতে পৌঁছানো সম্ভব। দ্বিধার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত আত্মোন্মচন সম্ভব।

নাটকে চারটি দৃশ্য আছে 'পথ', 'ঘাট', 'মাঠ' এবং 'গুহাদ্বার'। সময় জিনিসটাই খেলা তার অপসারণে জীর্ণতা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। তাই দৃশ্য পরিবর্তন করাটা নাটকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাটকের তত্ত্বের দিক থেকে যে নামকরণ করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ। পথে নামলেই পথ পাওয়া সম্ভব। প্রাণের আহ্বানে প্রাণকে সাড়া দিতেই হয়। কবিশেখরের কথায় আছে, 'আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।' অর্থাৎ পথ সেখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কবি এই কারণে হয়তো এই দৃশ্যের নাম 'পথ' রেখেছেন।

জীবনকে বুঝতে হলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। তবেই প্রকৃত জানা সম্ভব। মৃত্যুকে সাধারণভাবে আমরা জীবনের পরপার বলেই বিবেচিত করে থাকি। তাই পরপারের খবর নিতে হলে 'ঘাট'-এ পৌঁছাতেই হয় এবং ঘাটেই সেই 'সন্ধান' সম্ভব। ঘাটে আসলে বোধগম্য হয় জীবনসমুদ্রের এই পার থেকে ঐ পারে পৌঁছনোর রসায়নটি। জীবনকে প্রকৃতরূপে জানতে হলে সন্ধান করতে হয়; আর তা করতে গিয়ে ঘাটেই সেই যাত্রার সমাপ্তি। তাই এই দৃশ্যের নামকরণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলা যায়।

সত্যকে সহজভাবে জানতে গেলে অনেক বিষয় এসে উপস্থিত হয়, মাঝে মাঝে জীবনকে মৃত্যুর থেকে বহুদূরবর্তী বলেই মনে হয় পৃথক বলে মনে হয়। জীবন বা এপারকে মৃত্যু বা ওপারের সঙ্গে এক করে দেখতে গেলেই 'সন্দেহ' জন্মায় স্বাভাবিকভাবে। এই 'সন্দেহ' আমাদের মনের দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধে মূলত চারিদিক খোলা 'মাঠে'। সেখানে দিক ঠিক করা খুবই অসুবিধাজনক বিষয়। মাঠের মাঝখানটা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্থান। প্রবাদ কিম্বা প্রচলিত কথায় তার উল্লেখ আছে; কিন্তু তার সঙ্গে 'সন্দেহ'-এর ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ সংযুক্ত করে দিলেন এই সূত্রে। তৃতীয় দৃশ্যে তাই মাঠ এবং সন্দেহ নামগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

চতুর্থ দৃশ্যের নাম 'গুহাদ্বার'। এই গুহাদ্বারে না পৌঁছালে প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই যৌবনের দল অন্ধ বাউলের সহযোগিতায় গুহাদ্বারের সম্মুখে যায় এবং সেখানেই চন্দ্রহাসের প্রত্যাবর্তন ও প্রকৃত বুড়োর সন্ধান একসঙ্গে একই সরলরেখায় সঙ্ঘটিত হয়। মৃত্যুর সন্ধান কেউ দিতে পারে না, তাই তা অন্ধকার গুহাদ্বারের

মতো। প্রাণকে যারা তুচ্ছজ্ঞানে সেই অন্ধকার গুহাদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে জীবনের প্রকাশ তো সেখানেই সম্ভব। সুতরাং গুহাদ্বারেই প্রকাশ সম্ভব।

গীতি অংশের ভূমিকাগুলি হল 'নবীনের আবির্ভাব', 'প্রবীণের দ্বিধা', 'প্রবীণের পরাভব', 'নবীনের জয়'। নবীনের আবির্ভাব হয় বলেই যৌবন পথে নেমে জরা ও মৃত্যুরূপী শীতবুড়োর সন্ধান করা হয়। প্রবীণ মানুষের এই কাজে যোগদানের ইচ্ছা ও উৎসাহ কোনোটাই থাকে না। সুতরাং গানের শুরুতে নবীনের আবির্ভাব বলে যে-কথাগুলি বলা হয়েছে তা ভীষণ ইঙ্গিতপূর্ণ। দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকার নাম 'প্রবীণের দ্বিধা'। প্রবীণতার ধর্মই হল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। এই দৃশ্যে 'দুরন্ত প্রাণের গান' 'উদ্ভ্রান্ত শীতের গান'-কে পরাজিত করে 'নবযৌবনের গান'-কে চিরজাগ্রত করে তুলতে চায়। প্রকৃতপক্ষে 'শীত বিদায়ের গান'-এ আছে।

আমায় আবার কেন টানে !
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলে মার গো !

অর্থাৎ শীত বিদায় নেয় বসন্তকে স্থান করে দেবার জন্যেই। এই দৃশ্য প্রকৃতির কোলে অহরহ ঘটে চলেছে। আবার শীত যখন গোপন পথে পলায়ন করার কথা ভাবে তখন বসন্ত তাকে গোপন পথে পালাতে দেবে না—

'নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে, শীত, ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিনহাওয়ার 'পর।'

বসন্ত শীতের 'জীর্ণ জরার ছদ্মবেশ' উন্মুক্ত করে দিতে চায় প্রতিনিয়ত। চন্দ্রহাসের দলও সেইভাবে আদিকালের বুড়োর সন্ধান করে তার আচ্ছাদন উন্মোচিত করে দিতে চায়।

তৃতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকার নাম 'প্রবীণের পরাভব'। প্রবীণের প্রবীণতা প্রকৃতির নিয়মে একদিন পরাভূত হয়। নিজেকে লুকিয়ে রাখার পরম প্রিয় বাসনা একদিন ঘুচে যায়। সত্যসন্ধানীরা তাদের পরাজিত করবেই এই তাদের বাসনা। তাই তো গানের মধ্যে সেই বার্তা আছে—

'এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে।
কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে।।'

বসন্তের হাসির গান সব মলিনতা সন্দেহ ও প্রাচীনবেশকে পরাজিত করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। এইভাবে দেখলে এই অংশের নাম যথার্থ বলেই মনে হয়।

শেষ দৃশ্য বা চতুর্থ দৃশ্যের নাম 'নবীনের জয়'। নবীনের জয় মানেই আদ্যিকালের বুড়োর জরাবেশ খুলে যাবে, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের ফিরে ফিরে আসার কথা ঘোষিত হবে; আর আমাদের যা কিছু পুরাতন তাকেই নতুন বলে মনে হবে। গানে আছে—

'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলাম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে! '

নাটকের শেষে পুরাতন নতুন বেশে প্রবেশ করেছে—সর্দার নবীনরূপে ফিরে এসেছে। মৃত্যুতেই শেষ নয়। এমনি করে ঋতুর পর ঋতু এই খেলা চলছে প্রকৃতিরাজ্যে। এই কথা ফাল্গুনী নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই নাটকে দৃশ্যপটের কোনো নির্দেশ নেই বরং আছে চিত্তপট। এই চিত্তপটকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি নানান পরিবর্তন আনলেন নাট্যরচনা ও উপস্থাপনে। এখানে কবি বলেছিলেন চিত্রপটের প্রয়োজন নেই বরং দরকার চিত্তপটের। স্টেজ বা রঙ্গমঞ্চের ধরাবাঁধা নিয়মকে রবীন্দ্রনাথ ভেঙে দিতে চাইছেন। ফাল্গুনী নাটক কোন নির্দিষ্ট স্থানের নাম নিয়ে লেখা নয়। যে-কোনো স্থানে মিশে যেতে পারে। অভিনয়ের দিক থেকেও আছে বিস্তর স্বাধীনতা। নাটকের শুরুতেই নাট্যকার বলে দিলেন,'এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।' প্রধান চরিত্র বাদ দিয়ে কোন চরিত্রের নাম নেই বা কোনো চরত্রের নির্দিষ্ট কোনো সংলাপ নেই। যার যেমন খুশি সে তেমন ডায়ালগ বলতে পারে। সুতরাং ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাট্য পরম্পরায় একটি বিশেষ সংযোজন।

৩০১.৩.১০.৩ উপসংহার

প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যুকে হার মানিয়ে নবনবরূপে আত্মপ্রকাশ করবার বাসনা যেভাবে লক্ষ্য করা যায় তেমনি জরার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মানুষের যৌবনের নব নব প্রকাশ ঘটে থাকে। এই ঘটনা বলপূর্বক ঘটে না স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। ফাল্গুনী নাটকের আখ্যানভাগে এই কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বৈরাগ্যসাধনের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নেই সার্থকতা গতিশীলতার মধ্যে, চিরপ্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যেই। কবিশেখর তাই রাজাকে পথে বেরিয়ে আসতে বলেন। বসে থাকার মধ্যে বিমুখ থাকার মধ্যে আনন্দ নেই। সূচনা অংশের সঙ্গে মূল নাট্যাংশের কোন সম্পর্ক না থাকলেও কবি তাকে ভূমিকা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় অংশকে এই নাটকের গীতি অংশ বলা যেতে পারে। এই অংশের সমস্ত চরিত্র প্রকৃতিসংলগ্ন। 'বেণুবন', 'পাখির নীড়', 'ফুলন্ত গাছ' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভূতির চিত্রকে উজ্জীবিত করার প্রবণতাটি ধরা পড়ে। সেই কারণে এই নাটকে প্রকৃতিকে পটভূমি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল নাট্যাংশ এখানে চারটি দৃশ্যে বিভক্ত করে পরিবেশিত হয়েছে। এইভাবে ফাল্গুনী নাটকটির গঠনকৌশল সার্থক একটি নাটকে পরিণত হয়ে উঠেছে।

৩০১.৩.১০.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকের সূচনা অংশের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

খ) 'ফাল্গুনী' নাটকটি গঠনশৈলীর দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী—মন্তব্যটির ব্যাখ্যা করো।

৩০১.৩.১০.৫ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্র বিচিত্রা — বিশ্বনাথ দে,

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য — সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-নাট্যধারা — শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ — শ্রী প্রমথনাথ বিশী

একক -১১

'ফাল্গুনী' নাটকে গান, রূপক ও সাংকেতিকতা

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৩.১১.১ ভূমিকা

৩০১.৩.১১.২ ফাল্গুনী নাটকের গান

৩০১.৩.১১.৩ রূপক ও সাংকেতিকতা

৩০১.৩.১১.৪ উপসংহার

৩০১.৩.১১.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৩০১.৩.১১.১ ভূমিকা

হিরণকুমার সান্যাল 'রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমার গান, আমার ছোটোগল্প আর আমার ছবি এ তোমরা না নিয়ে পারবে না।' কবির জীবনে কবিতা ও ছোটোগল্পের পাশাপাশি গানকেও ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেন। তিনি শুধু এই তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠতে পারতেন বলে আমাদের মনে হয়। তবে সেই কারণে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ হিসেবে পরিচিতি কখনও খাটো হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক সমসাময়িক নাট্যচর্চার পটভূমির থেকে খুব সহজেই পৃথক করে নেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়লে দেখা যায়, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনব আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কোন নাট্যকারকে বিন্দুবিসর্গ অনুসরণ না করে, নিজস্ব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাই শ্রীভবতোষ দত্তের কথায়, 'রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা সাহিত্যে যেন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ এবং অনন্য।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান কথা হল—গানের ভিতর দিয়ে প্রাণের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করা। যে কথা বলা হল না, বা বলা গেল না; সেই কথা গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার ধারা ভারতীয় সঙ্গীতের মূল প্রবণতা। সেখানে রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গীতকে মাধ্যম করে নিয়েছিলেন অন্তরের আকুতি প্রকাশের। রবীন্দ্রনাটকে গানের একটি বিশেষত্ব আছে, তা হল কথা ও সুরের মিলনসাধন এবং তার মধ্যে দিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া। সংলাপকে অতিক্রম করে কথা ও সুরের মধ্যে দিয়ে তত্ত্বকে প্রকাশ করা রবীন্দ্রনাথের এক প্রচেষ্টা। চরিত্র সংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহকে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলার গানের প্রয়োজন হয়। কবির তত্ত্বনাট্যগুলির বিশেষত্ব হল—শব্দমাধুর্য্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতপূর্ণ গান। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর সঙ্গীতচিন্তার মৌলিকত্ব। রবীন্দ্রনাথ এই মৌলিকত্ব অনুভব করেছেন, গ্রহণ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন। সাহিত্যের ভূমিতেই সঙ্গীতের উদ্ভব এই অভিনব বিষয়টি বাঙালি পাঠক ও শ্রোতা দেখতে পেল। সঙ্গীতচিন্তায় পারিবারিক কাঠামো পারিবারিক ঐতিহ্য

ও সংস্কৃতি এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছিল বিশেষভাবে। সঙ্গীতরচনার ধারায় বাইরের ও ভিতরের বহু প্রভাবের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাইরে ছিল সমকালের সাহিত্যজগৎ, নাট্যচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সংগীত-চিন্তা আর ভিতরের দিকে ছিল দেশ বিদেশের সংগীতচর্চার অভিজ্ঞতা, নবনব ভাবনায় উদ্বুদ্ধ আত্মবিকাশের প্রয়াস। এই দ্বিতীয় ধারার দিকটি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। কবির আত্মসচেতন ও আত্মসন্ধানী মন কীভাবে প্রথাকে ভেঙে গড়ছেন সে কথা কবির গানের দিকে নজর দিলেই দেখা যায়।

মহারাজ যখন নাটকে গানের ব্যাপারে জানতে চান, তখন কবি উত্তর দিয়েছিলেন, 'গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।' গানের বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে বলা হয়গানের বিষয়বস্তু হল 'শীতের বস্ত্রহরণ'। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির কথা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে গীতি অংশের বুননে। গীতি অংশটি বাদ দিলে বাকি থাকে প্রাণের কথা, অন্তঃপ্রকৃতির কথা। নাটকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এই দুই দিক কীভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা গীতিভূমিকার দিকে তাকালেই বোধগম্য হয়। গীতিভূমিকা এইভাবে বিভাজিত'নবীনের আবির্ভাব' (বেণুবনের গান, পাখির নীড়ের গান, ফুলন্ত গাছের গান), 'প্রবীণের দ্বিধা' (দুরন্ত প্রাণের গান, শীতের বিদায়-গান, নবযৌবনের গান, উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান), 'প্রবীণের পরাভব' (বসন্তের হাসির গান, আসন্ন মিলনের গান), 'নবীনের জয়'(প্রত্যাগত যৌবনের গান, নতুন আশার গান, বোঝাপড়ার গান, নবীন রূপের গান)।

৩০১.৩.১১.২ ফাল্গুনী নাটকের গান

'ফাল্গুনী' নাটকের দুটি অংশ আছে একটি গীতি অংশ ও অপরটি হল মূল নাট্য অংশ। নাটকের গানে গানে বেজে উঠেছে অন্তঃপ্রকৃতির রাগিণী। কথা ও সুরে ধ্বনিত হয়েছে জীবনের আনন্দরস। গীতিভূমিকার গানগুলি ও শেষের উৎসবের গানটিকে একত্রে 'বসন্তের পালা' নামে ও মূল নাটক 'ফাল্গুনী' ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'সবুজপত্র'(১ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দু'টি অংশের জন্যে দু'টি পৃথক ভূমিকা কবি লিখেছিলেন। 'বসন্তের পালা'-র ভূমিকায় ছিল—"আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক 'ফাল্গুনী' বলিয়া একটা নাটকের ধরণের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মত তাহারি মুল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।" সেখানে ১ নং ছিল,'নবীনের আবির্ভাব'(বেণুবনের গান), (পাখির নীড়ের গান), (ফুলন্ত গাছের গান) যে গানগুলি পরে গ্রন্থাকারে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন,১৩২২) প্রকাশের সময় ১ম দৃশ্যের গীতিভূমিকা হিসেবে, দৃশ্যের শুরুতে আসে। অর্থাৎ এই তিনটি গান তারপরই দৃশ্য শুরু এবং গান 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে...।' এই দৃশ্যের একটি ভূমিকা 'নবীনের আর্বিভাবে' সূচিত হয়েছে। তাই দেখানো হচ্ছে, নবীনের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়েই যৌবনদলের আদ্যিকালের বুড়ো অনুসন্ধানের যাত্রা শুরু হয়। গীতি অংশের ভূমিকা ও মূল নাট্যাংশের দৃশ্যবিভাজন এই দুইয়ের ভিতর একটি নান্দনিক যোগ বর্তমান। তাই বেণুবনের গানে আছে—

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,...।'

'পাখির নীড়ের গান'-এও আছে সেই মনকে চঞ্চল করে তোলার বার্তা—

'আকাশ আমায় ভর্ল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হান্‌ব হাওয়ায়,
নাচের আবীর-হাওয়ায় হানে
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,'

'ফুলন্ত গাছের গান'-এ সেই বার্তা—

'আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার
বোঝে নিশার নীরব তারা।।'

মূল নাটকের ১ম দৃশ্যের নাম 'পথ' এবং সেখানে যুবকদলের প্রবেশ দিয়েই শুরু। তাই যুবকদলকে বুঝতে গেলে নবীনের আবির্ভাবের কথা আগে বুঝতে হয়। নবীনের আগমনবার্তা আমাদের চারপাশে আলোড়ন তোলে।

সবুজপত্রে প্রকাশের সময় ২ নং ছিল 'প্রবীণের দ্বিধা'। এবং সেখানে (দুরন্ত প্রাণের গান, শীতের বিদায়-গান, নবযৌবনের গান, উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান) ছিল। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি অংশের ভূমিকা হিসেবে যুক্ত হয়। ২য় দৃশ্যের নাম 'সন্ধান' (ঘাট)। গীতিভূমিকায় গানগুলি মনের গোপন চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে চায়। 'দুরন্ত প্রাণের গান'-এ আছে—

'আমরা খুঁজি খেলার সাথি।
ভোর না হতে জাগায় তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি...।'

বসন্ত এসে শীতের পর্দা টেনে খুলে ফেলতে চায়। গোপন পথে তার বিদায় দেওয়া বসন্তের কাজ নয়। তাই তাকে ভিতর থেকে জানান দিতে তার আর্জি—'শীতের বিদায়-গান' এ আছে—

'আমায় আবার কেন টানে !
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন করা ?

মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো।'

বসন্ত যেভাবে শীতের অবগুণ্ঠনবতী রূপ উন্মুক্ত করে দিতে তৎপর নাটকে তেমনি চন্দ্রহাসের দল আদ্যিকালের বুড়োর আবরণ উন্মুক্ত করে দিতে চায় সকলের সামনে বসন্ত উৎসবের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে।

'নবযৌবনের গান'-এ আছে
'নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে, শীত, ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার 'পর।'

সবুজপত্রে প্রকাশের সময় নাম ছিল—'প্রবীণের পরাভব' (৩ নং)। এই অংশটি স্বনামে তৃতীয় দৃশ্যের পূর্বে যুক্ত হয়ে যায়। নবীনের বাড়াবাড়ি রকমের আবির্ভাবে আর সে নিজেকে গোপন রাখতে পারছে না; তাই তার পরাভব শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রকৃতির মধ্যে এই ভাব কীভাবে দেখতে পাওয়া যায় তার কথা বলতে গিয়ে 'বসন্তের হাসির গান'-এ বলা হয়—

'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রাচীন প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে ...।'

প্রবীণ যখন নিজের চিরাচরিত বেশে আর নিজের ধরে রাখতে পারে না বা সক্ষম হয় না; তখনই তার পরাভব নিশ্চিত—

'আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে, ভাই, আমাদেরি।'

শেষ দৃশ্যের গীতিভূমিকার নাম 'নবীনের জয়' এবং দৃশ্যের নাম 'প্রকাশ'। দুই দিক থেকে সাযুজ্য রেখে গানগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। শেষ গীতি ভূমিকার নাম 'নবীনের জয়'। এখানে আছে—

'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে!'

প্রবীণের বেশ বার্ধক্যের বেশ শেষ সত্য নয়। সে বারবারই নব বেশে ফিরে ফিরে আসে এবং নবীনের জয় হয়। 'নতুন আশার গান' এ আছে,

'এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।'

যৌবনের কথা প্রাণের কথা শুভ সূচনার বার্তা দিয়েই তো শেষ হতে পারে। গানের অংশে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ফাল্গুনের আবির্ভাবে শীত কীভাবে বিদায়গ্রহণ করে। শীতের চলে যাওয়া সূত্রপাত হয় 'নবীণের আবির্ভাবে'। যৌবন-বসন্ত শীতের মধ্যে অবস্থিত জড়তাকে বাইরে টেনে আনতে চায়। আর সেখানে দেখা যায় প্রবীণতার ধর্মই হল দ্বিধান্বিত হওয়া। নাটকে মোট ৩০ টি গান আছে। সেই গানগুলি এই নাটকের পটভূমি ও পুরোভূমির মধ্যে একটি অন্বয়সাধন করে দেওয়া। অন্যান্য নাটকের থেকে এই নাটকের গানগুলি আমাদের প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করে বেশি। মানবজীবনের সমস্যাকে প্রকৃতির বুকে ঘটে চলা ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখানোর প্রয়াসকে গান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

৩০১.৩.১১.৩ রূপক ও সাংকেতিকতা

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক নাট্যকারদের ধারা অনুসরণ করে নাটক রচনা করেননি। তিনি স্বকীয় একটি মত ও পথ নির্মাণ করে নিয়ে সেই পরমপ্রিয় পরিচিত পথে চলেছেন শেষপর্যন্ত। তাই তাঁর নাটকগুলি একবার পাঠ করেই বা একবার দর্শকাসনে বসেই বোধগম্য নাও হতে পারে। অনুভূতি ও উপলব্ধির বিচিক্ষণতা না থাকলে তাঁর প্রায় কোনো নাটকই আমাদের বোধগম্য হয় না। 'ফাল্গুনী' এমনই একটি নাটক। যার পূর্বে 'সূচনা' বা 'বৈরাগ্যসাধন' অংশটি যুক্ত করে দিতে হয় পরবর্তীকালে। কবির দ্বারা সৃষ্ট রূপক ও সাংকেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সম্পদ ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক, রবীন্দ্রনাথ এই নাটক সম্পর্কে ঠিক কী বার্তা দিচ্ছেন! চৈত্র, ১৩২১ সালের সবুজপত্রে প্রকাশের সময় গীতি অংশের ভূমিকায় কবি বলেন, 'আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন।' সেই সময় মূল নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—'বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্তযাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই; ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যাই হউক, ইহা ইতিহাস নহে...।'

মূল নাটকের পূর্বে সূচনা অংশে আছে—মহারাজ সেখানে কবিশেখরকে বলছেন—'হাতে কিছু তৈরি আছে হে ? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা...।' উত্তরে কবিশেখর বলেন তৈরি আছে, কিন্তু সেটা নাটক কি প্রকরণ কি রূপক কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না। ...আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কবি আরও বলেছেন এর মধ্যে কোনো তত্ত্বকথা নেই; শুধু প্রতিষ্ঠিত করছে 'আমি আছি'-র বার্তা।

রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে মানবসমাজের জড়তা, কুসংস্কারাচ্ছন্নমুক্ত একটি সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই এই ধারার নাটকগুলিতে—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'অচলায়তন' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১১), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটকগুলিতে এই সমস্যাগুলির কথা কৌশলে বর্ণনা করেছেন এবং ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন। 'ফাল্গুনী' নাটকে ছেলের দল প্রাণের প্রতীক, জীবনের প্রতীক, জয়ের প্রতীক। প্রাণের ধর্মই হল কেবল চলা। তাই তারা উদ্ভ্রান্ত পথিক। তাদের লক্ষ্য স্থির নয়। আর শীতবুড়ো হল মৃত্যুর প্রতীক। বসন্ত এসে নবপ্রাণের স্পর্শে শীতকে যেমন বিদায় করে দেয়, নবরূপে নবযৌবনকে প্রস্ফুটিত করে দেয় তেমনি বালকদলের প্রচেষ্টায় সর্দারের নবরূপে প্রকাশ দেখানো হয়। একটি বাইরের দৃশ্য ও একটি ভিতরের দৃশ্য। একদিকে প্রকৃতিতে লীলা চলছে অন্যদিকে মানবজীবনের অভ্যন্তরে লীলার সমাবেশ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম না করলে নবজীবন লাভ করা যায় না। ছেলের দল মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর

ভয়কে পাশ কাটিয়ে কোনো এক অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল বলেই নবজীবনের বার্তা লাভ করতে পেরেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বলেছেন,"ফাল্গুনীতে তত্ত্বটাই প্রধান, তত্ত্বই ইহার মেরুদণ্ড; একটি তত্ত্ব বা আইডিয়াকে রূপায়ত করিবার জন্যই উৎসবে আয়োজন, 'বৈরাগ্যসাধন' ভূমিকার দৃষ্টান্তস্বরূপই বসন্তোৎসবের মধ্য দিয়া আখ্যানভাগকে উপস্থিত করা হইয়াছে। উৎসব এখানে তত্ত্বের বাহনমাত্র,তাই ফাল্গুনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।" এই নাটকের ভিতরের সহজ কথাটি টের পাওয়া যায় যদি এই সরল রসায়নটি উপলব্ধি করা যায় তবেই।

৩০১.৩.১১.৪ উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রতিভাবলে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। একটি নাটক রচনা করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, দীর্ঘ পরিশ্রম করে তার রূপ ও ভাবকে ফুটিয়ে তুলতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অতীতের স্মৃতি'-তে উল্লেখ করেছেন ১৯০৮ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতনে একশোর কাছাকাছি ছাত্র। আশ্রমবাসীদের জন্যে গুরুদেবের বিশেষ ব্যবস্থা। কবি সেখানে খোলা জায়গায় মহড়া পছন্দ করতেন, 'ফলে, শুধু অভিনয়ে যোগদানকারীদের নয়, আশ্রমবাসী সকলেরই নাটক ও গানের মহড়া থেকে অনেক-কিছু শিক্ষালাভ হত। ... গান-শেখানোর জন্য কোন নিয়মিত ক্লাস ছিল না, কিন্তু গান গাইতে পারতেন প্রায় সকলেই। গান ছিল সমস্ত আবহাওয়ায়, তেমনটি আর হয়নি।' রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, কলকাতার নাগরিক ও বিদগ্ধসমাজ ভীষণভাবে গ্রহণ করেছিল সে'টি হল 'ফাল্গুনী'। এর গানগুলি সকলকেই মুগ্ধ করে। গানের কথা ও সুর বসন্তের আবহাওয়াকে রঙিন করে তোলে। প্রতি বসন্তে 'ওগো দখিন হাওয়া-' —গান কচিগলার মিষ্টিসুর সকলকে মোহিত করে। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকের মন একধার থেকে নামঞ্জুর কর দেয়।'সুতরাং গান রবীন্দ্রনাথের কাছে বাস্তবজীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৩০১.৩.১১.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) রবীন্দ্রনাটকে গানের গুরুত্ব এবং 'ফাল্গুনী' নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলো।

খ) 'ফাল্গুনী' নাটকে গীতি অংশের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য উপস্থাপন করো।

৩০১.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থ

সাংকেতিক নাটক — অশোক সেন

রবি-দীপিতা — সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

একক -১২

চরিত্র বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৩.১২.১ ভূমিকা

৩০১.৩.১২.২ চরিত্রচিত্রণ

৩০১.৩.১২.৩ উপসংহার

৩০১.৩.১২.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১২.৫ সহায়ক গ্রন্থ

৩০১.৩.১২.১ ভূমিকা

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের বারো নং কবিতায় আছে—

'জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলে নি তার।'

রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছাপ থাকাটা খুব সাধারণ একটি প্রবণতা। চরিত্রনির্মাণে তাই আমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাই। ফাল্গুনী নাটকের আখ্যানভাবে আছে বহিঃপ্রকৃতিতে বসন্তের শিহরণ জাগলে মানুষের অন্তপ্রকৃতিতে তা জোয়ার ওঠে। আনন্দচঞ্চল নবযুবকের দল তখন ছুটে চলে সেই ধারাকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে। জটিল বুদ্ধির রোগে আক্রান্ত দাদাকে তারা বাইরে টেনে নিয়ে আসে কোলাহল করতে করতে। কোলাহলের শব্দে সর্দার আর ঘরে টিকতে না পেরে একটি নতুন খেলার পরামর্শ দেয়। সেই খেলাটিই আদ্যিকালের বুড়োর সন্ধান। ঘাটের মাঝি, গাঁয়ের কোটাল সেই পথের সন্ধান দিতে না পারলেও বুড়োর সন্ধান দেয় এক অন্ধ বাউল। সেই অন্ধ বাউলের নির্দেশিত পথ ধরেই চন্দ্রহাস বুড়োকে ধরে আনে। দেখা যায় সর্দারই বেশ বদল করে যুবক বেশে গুহাদ্বার দিয়ে বাইরে আসছে। এই কাহিনিটি পরিবেশনের জন্য কবি যে ধরনের চরিত্রের নির্মাণ করেন তা অভিনব ও বিস্ময়ে পরিপুর্ণ। রবীন্দ্রনাটকে মাঝি, পথিক, জনতা, কোটালের মতো উপেক্ষিত অবহেলিত চরিত্র এই নাটকে তথা রবীন্দ্রসৃষ্টিতে মহান আদর্শরূপে স্থান পেয়ে যায়। এই গোত্রের অতিসাধারণ মানুষও কবির স্পর্শে অসাধারণ হয়ে ওঠে। যেমন মাঝি হয়ে উঠেছে অসাধারণ একটি চরিত্র। তার কথাতে দর্শন মিশে যায় এইভাবে—তাকে যখন ছেলের দলেরা জানতে চায় বুড়োর খবর তখন মাঝি বলে,'ভাই, আমার ব্যবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা; কাদের পথ,

কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।' মাঝির মুখে এই ধরনের কথা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবি এই চরিত্রগুলিকে মহান করে তোলেন। দুই ধারার চরিত্র কবি কীভাবে গড়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩০১.৩.১২.২ চরিত্রচিত্রণ

রাজা

মহারাজ চরিত্রটি সূচনা অংশেই বিবৃত হয়েছে। পরে মূল নাট্যাংশের কাহিনিতে আর তার কোন ভূমিকা নেই। ধীরে ধীরে কর্মবিমুখ রাজা নিজছন্দে ফিরেছেন, নিজের কাজে ফিরেছেন। মন্ত্রীকে রাজকার্য্যের জন্যে যে ভার দিয়েছিলেন, হঠাৎ করে তাঁর মনে হল মন্ত্রীর বুঝি বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে কোনক্রমে। শ্রুতিভূষণের আগমনবার্তাকে মহারাজের এখন ভীতিপ্রদ বলে মনে হয় 'ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো, একটা যা-হয় কিছু করো, যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি তাই করছে তেমনিতরো।' এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের অবতারণা। নাটকে মহারাজের জীবন সম্পর্কে কৌতূহল আমাদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে। জীবনের মূল কথাগুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে। তাঁর মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে মুক্তির বাণী এবং সেই দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন ক্রমশ। মহারাজের অনুরোধে উপস্থাপিত নাট্যাংশের বিষয় ও মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাকে এক রেখায় বিচার করে সমাধানের পথ খুঁজে দেখার প্রয়াস আছে। এইভাবে মহারাজের সমস্যা ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে বিশ্বজগতের সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে।

মহারাজের মন খারাপের কারণ হল—যমরাজ স্বয়ং কানের পাশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে শ্রুতিভূষণকে ডেকে বৈরাগ্যসাধনের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে চাইছেন। বৈরাগ্যবারিধি পুথি অনুসরণ করে এই সাধনায় নিমগ্ন হতে চান। যেখানে ভিক্ষা অন্নের নয় আয়ুর সেখানে কী দুর্ভিক্ষকাতর দরিদ্র প্রজা কী রাজা সকলেই একসারিতে অবস্থান করে। সেই কারণে মন্ত্রী অনুরোধ করে, 'মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে, অবসাদগ্রস্থ নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।' অবশ্য নাটকে ধনাভাবের একটি ব্যাখ্যা নাট্যকার দিয়েছেন মহারাজের মাধ্যমে এইভাবে—'মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার। এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।' মন্ত্রী যাকে দেখেছেন অর্থ তাকেই সাধারণে দেখে পরমার্থরূপে। এই অভাব তো শুধুই ধনের নয় তা এই কথা থেকে বোধগম্য হয়—আসলে এই অভাব হল আমাদের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকা জ্ঞানের কথাকেই চাগিয়ে তোলা বা সতেজ ও প্রবল করে তোলার জন্যেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে এই পর্যায়ের চরিত্র উপস্থাপন করেন। এই চরিত্রটির উপস্থিতি আমাদের মধ্যে জানান দেয় যে, মুক্তি শুধু একদিক থেকে আসে না অন্তরের জ্ঞানালোকের উন্মেষের দিকটিও এক্ষেত্রে জরুরি একটি বিষয়।

কবি

১৩২২ সালে কলকাতায় অভিনয়ের পূর্বে যে ক্ষুদ্র নাটিকাটি সংযুক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; সেই প্রথমাংশের অভিনয়কালে তিনি নিজেই কবিশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মহারাজ যখন বৈরাগ্যসাধনের সংকল্প করে বসেছেন তখন কবি বলেছে, 'এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।' কবির কাজই হল নতুন

নতুন কথা, সুর ও ছন্দ সৃষ্টি করে বৈরাগ্যের সাধনা করা। তাই তো লক্ষ্মী তাদের ত্যাগ করে আর তারাও লক্ষ্মীকে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায়। জগতের মধ্যে যে চিরনবীনতার বাণী সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়ে উঠছে 'এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছায়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে, সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব কর নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।' কবি সেই কথা মহারাজকে বলেছে'এ যৌবন ম্লান যদি হ'লো তো হক না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসচেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চ'লচে।' জীবন শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ব্যাপ্তির স্ফূর্তি, স্ফীত স্পর্ধা। জীবনকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। মহারাজের ব্যাখ্যার সঙ্গে কবির ব্যাখ্যা স্বভাবতই পৃথক হয়ে যায়। যেখানে মহারাজের কথা বৈরাগ্যসাধনের, সেখানে কবির মন্ত্র—'ওরে ভাই, ঘরের কোণে থলি থালি আঁকড়ে বসে' থাকিসনে—বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল !' বহু পূর্বে কবি বলেছেন, 'পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সতরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি।' অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগ উভয়ের সামঞ্জস্যেই গড়ে ওঠে আমাদের পূর্ণশক্তি। জীবনের ধর্মপালন যথার্থ বৈরাগ্যের সাধনা। তাই নিরাসক্ত যৌবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মহৎ কর্মসাধনের বলা বাহুল্য মুক্তির প্রধানতম উপায়টি। উপনিষদেও এই কথা আছে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে। মহারাজের মনকে শান্ত করতে কবি বলেছে, 'আমরা কেবল ছাড়্তে ছাড়্তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।' কবির ভূমিকা তো এখানে স্রষ্টার আসন গ্রহণ করে মহারাজের মধ্যে দিয়ে মূল বার্তাটি ধ্বনিত হয়েছে। একটি উপমার কথা বলে তার অবদানের কথা শেষ করা যাক—'মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে।' তাই কবি ডাক দিয়েছে সকল শ্রেণির মানুষের সুখ-সুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

সর্দার

যৌবনের প্রাণশক্তি যে মানুষের মনোবৃত্তিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে সর্দারকে দেখে সেকথা প্রমাণিত হয়। তার সম্পর্কে শুরুতেই বলা হয়েছে, এই নাটকে দু'জন প্রধান পাত্র—প্রথম সর্দার আর দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। সর্দার এখানে একটি রূপক চরিত্র। এই নাটকে সে কোনো বিস্তৃত অংশ অধিকার করে আছে এমনটা নয়; কিন্তু মূল কথাগুলি সর্দার বলেছে। যুবকদলের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের বাণী সেই বহন করে আনে। সে সকলকেই চালনা করে এবং সমানের দিকে পথ দেখায়। এই নাটকের যেখানে আমরা পৌঁছাতে চাইছি সেই স্থানের প্রধান পুরুষ এই সর্দার। যুবকদলের উদ্দাম ও উন্মত্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধার করেছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির মধ্যে জীবনের প্রকৃত পথের সন্ধান মেলে না; কিন্তু সেই প্রাণাবেগকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে জীবনে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এই

আনন্দ হারিয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। এই বিষয়টি নাটকে সত্য করে দেখিয়েছে সর্দার। তাই সে ছেলের দলকে দেখে বলে,'পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিক-মাসের সাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রঙ থাকবে না। আচ্ছা, এক কাজ কর...।' সর্দারই তাদের মধ্যে শীতবুড়োকে ধরে আনার কথা প্রকাশ করে। ছেলেরদল সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ঠিক হয়, তাকে ধরে এনে 'বসন্ত উৎসব' করা হবে।

এই চরিত্রটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি,'আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো-একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যিকারই সর্দার।' তার কাজ এক সংকট থেকে অন্য সংকটে যাত্রা করা—কোনো কিছুর নিষ্পত্তি করা তার কাজ নয়। সেখানেই সর্দারের সর্দারি। নাটকে চন্দ্রহাস কোটালকে বলে, 'আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হূহু করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁশ নেই।' নাটকের এই মোক্ষম কাজটি করে সর্দার। সে আমাদের আড়ালে থেকে চিরনবীন প্রাণকে সতেজ করে রাখে। নাটকের শেষে বুড়োর খোঁজ করতে গিয়ে সর্দারকেই ছেলেরদল ধরে বসে। সর্দারের পিছনে অনেক ভয়ঙ্কর ও অভিনব রূপের কথা শোনা যায় সেই বুড়োর সম্পর্কে; কিন্তু যখন সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসে তখন ছেলেরদল বলে 'এখন মনে হচ্ছে, যেন তুমি বালক।' চন্দ্রহাস বলে,' এ তো বড়ো আশ্চর্য্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম ! বাউলের গানে সেই কথা ধরা আছে,

'তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,'

দাদা

দাদা চরিত্রের গুরুত্ব বস্তুতান্ত্রিক ভাবনার রূপক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সব চেয়ে কম। সে-সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সব-চেয়ে প্রবীণ...।'প্রাণের অনন্দটাকে যে সবসময় অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই সে সার মনে করেছে। এই নাটকে যুবকদল যাকে দাদা বলে তার বয়স সব থেকে কম; কিন্তু তাকেই বেশি বয়সের বলে মনে হয়। সে সবে চতুষ্পাঠীতে থেকে উপাধি নিয়ে প্রবীণের মতো আচরণ করে। তার বয়স যত বেড়েছে ততই তার পরিবর্তন ঘটে গেছে। শেষপর্যন্ত সে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি। উৎসবের দিনে যুবকদলের সঙ্গে যোগদান করেছে সে। জীবনের মধ্যেই গোপন থাকে বৈপরিত্যের সুর। একদিকে যেমন থাকে নবসৃষ্টি, নবপ্রেরণা, নবপ্রাণের গতিশীল জীবন তার ঠিক বিপরীতে অবস্থান করে জরা, স্থবিরতা, গতানুগতিকতা প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় ধারার জীবনের প্রতীক দাদা চরিত্র। তার কাছে জীবন মানেই চৌপদী সহযোগে কাব্যিকতা, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতা যেন। তার উঠতি বয়সে প্রবীণের মতো হাবভাব।

যখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতলোকের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করছে যুবকদল তখন তাদের উৎসাহকে বাধা দেওয়ার কাজ করে এই দাদা চরিত্র। দাদার কাজে নেমেও হিসাব মেলানোর অভিজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। তাই সে দিন রাত্রি কবিতা লেখে আর যাকেই সামনে পায় ধরে ধরে চৌপদী শোনায়। তার ধারণা তার কবিতার মধ্যে 'সার' আছে 'ভার' আছে। কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো সৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, তা বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে।

যুবকদল

এই নাটকের যুবকদলকে চিরযৌবনের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। যৌবন-শক্তি মানবজীবনের আদি-অন্তহীন। যৌবন-শক্তির মধ্যেই চিরন্তন গতিবেগ বর্তমান। তাই চিরপ্রবাহমানতা, গতিবেগ ও চঞ্চল প্রাণশক্তির প্রতীক এই যৌবনের দল। শুরুতেই তাদের গুরুত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাহাদেরই কথাগুলির সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।' এবং আমরা দেখেছি নাটকের শুরুতেই কবি বলে দিয়েছেন, আই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দলের কেবলমাত্র চন্দ্রহাস, দাদা, ও সর্দার ছাড়া কারও নাম নির্দিষ্ট করা হয়নি। নবযৌবন দলকে উপস্থাপন করার কয়েকটি তাৎপর্য আছে। পথে নামলে তাদের দলের মধ্যে যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়; তা যেন আমাদেরই মনের দর্পণস্বরূপ। কবি এখানে দেখাতে চেয়েছেন—জগতে জরা ও বার্ধক্যের মধ্যে দিয়ে না যেতে পারলে জীবনের প্রকৃতরূপ উন্মোচন করা অসম্ভব ও অবাস্তব।মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলার সমাবেশ দেখা যায় প্রতিনিয়ত। সেই অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে নবযৌবনের দূতেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লব করে যৌবনকে মুক্ত করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের অনেক দ্বিধা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই সকালবেলায় যে উৎসাহ নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিকেলবেলার আলো তাদের ঠাট্টা করে। জীবনের ধর্মই হল সন্দেহ। তাই তাদের চলার পথে মনে হয় 'ঠকলুম বুঝি রে।' ক্রমে একসময় মনে আসে সর্দারই হয়তো তাদের ঠকিয়েছে। শীতের শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে গেলেই তবে বসন্তের নবপল্লবের সূচনা হয়। একইরকমভাবে ছেলের দল তাই শীতবুড়োকে খুঁজতে চেয়েছে, তাকে ধরতে চেয়েছে। সেই কারণে কোটালের কাছে এই স্বরূপটি হল ছেলের দলের—'পাগলামি','অদ্ভুত','সহজ মানুষ নয়','তারা ভালো কাজ করে না' ও 'ছেলেমানুষ'। এই 'ছেলেমান্‌ষি'-তে দাদার কাছেও ধরা পড়েছে তারা। এই ছেলেমান্‌ষিতে তারা পাকা হয়ে গেছে; যদিও এই কাজে সর্দার সকলের থেকে এগিয়ে ও প্রবীণ। কোটাল ছেলের দলকে এইভাবে বিচার করে। কবি এইভাবে নবযৌবনের দলকে উপস্থাপন করে নাটকীয় দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছেন।

চন্দ্রহাস

নাটকে যাকে সকলেই ভালোবাসে, সকলেরই প্রিয়পাত্র যে, সে হল চন্দ্রহাস। বাইরের জগতে যখন নানান প্রতিবন্ধকতা তখন চন্দ্রহাস আমাদের এগিয়ে গিয়ে জয় করতে শিখিয়েছে। সে আমাদের প্রাণে রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়ে যায় রঞ্জনের মতো। তাই তো সে একটু সরে গেলেই রস থাকে না—'ও কাছে থাকলে মনে হয়, কিছু হোক বা না হোক তবু মজা আছে। এমন-কি বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।' আমরা 'যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।' কিন্তু যখন সে থাকে না তখন তার অভাব অনুভব করি। চন্দ্রহাস যুবকদলের সেই সাহস, সেই চাঞ্চল্য। তার তার অনুপস্থিতে সকলে টের পায় তার গুরুত্ব কতখানি! সে নাটকে যৌবনের মন্ত্রকে ধরে রেখে শীতবুড়োকে ধরে আনে। আর তা না হলে কীসের যৌবনশক্তি !

সে তো অন্যের মতো পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। বসন্তের কচি পাতায় ছোট ছোট লতা পাতার মধ্যে যে বার্তা এসে পৌঁছেছে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে বলে, 'আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে

পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।' সে বীর সৈনিক। তাই বীরের মতো জয় করা অর্জন করার মধ্যে সে আনন্দকে খুঁজে পায়। তাই সে বাউলকে যাত্রা পূর্বে বলে যায়—'আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।' গুহার ভিতর থেকে জয় করে ফেরার সময় চন্দ্রহাস বলে, সে তো চোখ দিয়ে দেখেনি তাই বুড়োর রূপ ঠিকভাবে বর্ণনা করা যাবে না। বরং সে সামনে আসলে সকলেই তাকে দেখতে পাবে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল সর্দার গুহাদ্বার থেকে বেরিয়ে আসছে। সে ফিরে ফিরেই প্রথম! ছেলের দলের প্রধান হয়ে সে এই বার্তাটি আমাদের জ্ঞানালোকের শিখাটিকে প্রজ্বালিত করেছে। আমাদের প্রজ্ঞার প্রগাঢ় ভাবনাসূত্রটিকে এইভাবে চন্দ্রহাস ধরিয়ে দিয়ে যায় কালে কালে।

অন্ধ বাউল

এই চরিত্রটি রূপক চরিত্র। সে একদিকে বাউল আবার অন্যদিকে অন্ধ। অর্থাৎ চৌপদী, পাণ্ডিত্য, পুথি ও বিতর্কএসব থেকে সে অন্ধ। নাট্যকার বাউলের দর্শেন্দ্রিয়কে মুছে দিয়েছেনতাকে অতীন্দ্রলোকের সন্ধানকারী হিসেবে অঙ্কন করবেন বলেই। সমস্ত হৃদয় দিয়ে সে বিশ্বের প্রাণলীলাকে অনুধাবন করতে চায়। তাই তাই অন্তর ও বাহির এক সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বারবার।

যে-কোনো কাজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে করলেই প্রকৃত কাজ হয়ে ওঠে, সেটা আর ফাঁকি থাকে না। আমরা শুধু কান দিয়ে শুনি তাই না শোনার শব্দগুলি তার বাইরে থেকে যায়; কিন্তু সমস্ত দিয়ে শুনলে অনেক না জানা না শোনা শব্দ শুনতে পাওয়া যেতে পারে। বাউল বলে, যে বুড়োকে সকলেই ভয় করে সে কিন্তু ভয় করে না। সে বলে 'একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম তখন ভয় হল, দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু, চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।' সে গান গেয়ে পথের সন্ধান করে এবং পথের সন্ধান বলেও দিতে পারে। বাউলের গানই তার শক্তি, তাই গান আগে আগে চলে আর সে পিছনে পিছনে চলে। গান না গাইলে সে তো পথ পায় না। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় চৈত্র ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। সুতরাং বোধগম্য হয় এই চরিত্রটির গুরুত্ব কতখানি!

৩০১.৩.১২.৩ উপসংহার

আসা-যাওয়ার মধ্যেই জীবনের গতি বহমান থাকে, সজীব থাকে, তাজা থাকে। আমাদের মধ্যে যে মূল্যবান প্রাণের অস্তিত্বতাকে খুঁজে নিতে হবে, তাকে উদ্ধার করতে হবে। এখানেই লুকিয়ে আছে প্রাণের সর্দারি করার মনোভাব। চিরনবীন প্রাণ তাই বারেবারেই নবীন, ফিরে ফিরেই নতুন। সেইকারণে প্রবীণ হবার কোনো সুযোগ নেই। বাইরের দৃষ্টি চলে গেলে জেগে ওঠে অন্তরের দৃষ্টি। তখন আর দৃষ্টি হারানোর ভয় থাকে না, বা পথ হারানোর ভয়ও থাকেনা। সেই কারণে জীবন একটি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই খেলা নিত্যদিনের বলা বাহুল্য এই খেলা চিরন্তন। যখন জীবনের পাত্র পূর্ণ হয়ে আসে তখন নতুন করে অমৃতরূপ ধারণ করে নতুন অবয়বে ভরে ওঠে। যাকে অনেক দূর থেকে ভয়ঙ্কর মৃত্যু বলে মনে হয়; জ্ঞানপ্রাপ্তির পর দেখা যায় সেই অন্ধকারের গুহাভ্যন্তর থেকে নবীন হয়ে বেরিয়ে আসছে। সে সর্দার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বিশ্ববিধাতা এই বার্তা আমাদের দিয়ে চলেছেন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। আমরা যেন সেই বার্তাকে উপেক্ষা না করি। তাই এই বার্তা বহন করে চলেছে নাটকটি কাল থেকে কালান্তরে।

৩০১.৩.১২.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) 'ফাল্গুনী' নাটকে চরিত্র উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের অভিমুখ কেমন ছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

খ) অন্ধ বাউল চরিত্রটি মূল নাটকের প্রেক্ষিতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করো।

৩০১.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থ

কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক — শঙ্খ ঘোষ

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা — নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্র-চর্চা — হরপ্রসাদ মিত্র (সম্পাঃ)

পর্যায় গ্রন্থ-৪

তাসের দেশ

একক-১৩

তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৪.১৩.১ : ভূমিকা

৩০১.৪.১৩.২ : পেক্ষাপট

৩০১.৪.১৩.৩ : সারসংক্ষেপ

৩০১.৪.১৩.৪ : মূল থীম বা ভাবসত্য

৩০১.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৪.১৩.১ - ভূমিকা

সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে ভারতের অন্যতম একটি প্রাগ্রসর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলে। সুবৃহৎ ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা প্রায় সকলেই মননসাধনার সঙ্গে সঙ্গে কলাচর্চার বিভিন্ন শাখায় যে ঋদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কলাসাধনার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যমে তাঁর সন্তানদের জীবনে প্রথম থেকেই এই প্রেরণা জাগে। ভারতীয় ধ্রপদী সঙ্গীতের উজ্জীবন ঠাকুর পরিবারে সার্থকভাবে সম্ভব হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের সকলেরই ছিল আশ্চর্য সঙ্গীতপ্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, কালোয়াতি গানে পারঙ্গম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর কাছে দেশি গান, তারপর ওস্তাদ যদুভট্টের তত্ত্বাবধানে, শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে গান শেখেন। এর সঙ্গে তরুণ কবির য়ুরোপবাস আর জ্যোতিদাদার প্রভাব থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। পারিবারিক আবহ থেকে, পরিবেশ পরিজনের কাছে থেকে মনের অনুকূল ধাতে সঙ্গীতরসসুধা গ্রহণ করে ক্রমশই তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি দেশীয় বাউল, কীর্তন বা লালন ফকিরের গানের জগতও রবীন্দ্রমানসের সাঙ্গীতিক বিভাকে করেছে প্রসারিততর।

নৃত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় প্রথমবার বিলেতবাসের সময়ে। পাশ্চাত্য নৃত্যে প্রাণের উচ্ছ্বসিত রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন অল্পবয়সী কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর দেখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধ্রুপদী নৃত্য, জাপান ও জাভা দ্বীপের নৃত্যশৈলীতে তাঁর মন অধিকতর আশ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর প্রথম নাট্যসৃষ্টি 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তাতে বিশুদ্ধ নৃত্যের সংস্থান ছিল না। গীতিনাট্যরূপে গানসহযোগে অভিনয় মাধ্যমে উপস্থাপনাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। গীতিপ্রাণ কবির সৃষ্টিতে গানের ও নৃত্যের মেলবন্ধনে যখন অভিনব শৈলীতে পূর্ণাঙ্গ নাট্যসৃষ্টির রূপায়ণ ঘটল, তখন অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা (১৯১২) এবং সেই প্রতিষ্ঠানে নৃত্যকলা শিক্ষারও ব্যবস্থা, তার গুরুনিযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের যথাযথ পর্বগুলি শুরু হয়ে গেল। রবীন্দ্রভাবনৃত্য হয়ে উঠল বিশেষ এক কলা বা শৈলীসমৃদ্ধ শিল্প, যার মধ্যে ধ্রুপদী নৃত্য, লোকনৃত্য, বিদেশি নাচ প্রভৃতির রাসায়নিক সংশ্লেষে গড়ে ওঠা নতুন আবেদন এবং আঙ্গিক। যার সম্পর্কে আশ্রম কন্যা অমিতা সেনের উক্তি থেকে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাবে — রবীন্দ্রনাথের নাচ হল ভাবের নাচ। আকাশের কোলে মেঘের খেলা। পাতায় হাওয়ার কাঁপন, ঘাসে ঘাসে আলোর পুলক, উছলে পড়া চাঁদের আলো, ফুল ফোটা ঝরা, শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি - মানুসের মনের আনন্দ হিল্লোল, দুঃখ বেদনায় হৃদয়ের আকুলতা সব কিছু ব্যক্ত হয় এই ভাবনৃত্যের ভঙ্গিতে, চোখে মুখের ভাবে। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা, ঝড়ের মত্ত মাতামাতি উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গ — সবই এই নৃত্যে রূপ পায়।

নাট্যচর্চায় ঠাকুর — পরিবারের বিশিষ্ট অবদানের কথা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। ১৮৭৪ থেকে অপেরাধর্মী গীতিনাট্যের একটি ধারা খুব শিল্পসম্মতভাবে না হলেও, এদেশে গড়ে উঠেছিল। এরই পর্যায়ভুক্ত একটি উপস্থাপনা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেখা গেল ১৮৭৯ তে। রচয়িতা স্বর্ণকুমারী দেবী। নাম 'বসন্ত উৎসব'। পরের বছর অভিনীত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'মানময়ী'। দক্ষ সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতসমৃদ্ধ এই উপস্থাপনার পরের বছর ১৮৮১ তে বিদেশ প্রত্যাগত তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। জোঁড়াসাকো বাড়ির ভারতী-উৎসবে এই অভিনব গীতিনাট্য গুণীজনসমাবেশে অভিনীত হবার পর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এতে সেই প্রথম অভিনয়কালে সংগীত ও অভিনয় যতটা ছিল নৃত্যপ্রয়োগ ততখানি ছিল না। পরবর্তীকালে এই বিশিষ্ট মাধ্যমটি ক্রমে সংগীত, নৃত্য ও নাট্যরসসহযোগে গীতিনৃত্যনাট্যরূপে সমাদর লাভ করে। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে পড়ে কালমৃগয়া (১৮৮২), শারদোৎসব (১৯০৮), ইত্যাদি, দ্বিতীয় পর্বে বসন্ত (১৯২৩), নটীর পূজা (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য রচনা এবং তৃতীয় তথা শেষ পর্বে রচিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিনৃত্যনাট্যগুলি। যেমন শাপমোচন (১৯৩১), তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯) প্রমুখ।

৩০১.৪.১৩.২ - প্রেক্ষাপট

বিশ্বভারতীতে পূজাবকাশের আগে আসন্ন উৎসবের প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করার রীতি প্রচলিত ছিল। তারই তাগিদ থেকে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিকদের অভিনেয় একটি নাটক রচনা করার জন্য অনুরুদ্ধ হ'ন। সেটা ছিল ১৯৩৩ সাল। কবি তাঁর অতীতে লেখা একটি গল্পের কথা স্মরণ করলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আসাঢ় মাসে তিনি লিখেছিলেন 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে এক অদ্ভুতরসের গল্প। গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে সংকলিত সেই কাহিনীরই নির্যাস নিয়ে তার সঙ্গে অনেকগুলি গান জুড়ে নাট্যরূপ দিলেন নতুন লেখটির। সৃষ্টি হল 'তাসের দেশ'।

রূপকথার জগতের আবহের মধ্য যে সমস্ত পাত্রপাত্রী আসর জমিয়েছে তারাও যেন বা রূপকথার জগতেরই — রাজপুত্র, সদাগরপুত্র। রাজ্যটি শুধু তাসের রূপকে মোড়া। নির্দিষ্ট ছাপমারা তাসের যেমন নির্দিষ্ট মান, তেমনই মাপে-জোকে খোপের মধ্যে বসানো তাসের দেশের নারী-পুরুষ। সেখানেও রাজা আছে, রাণী আছে, আছে রাজকুমারী, পণ্ডিত, গোলাম, সৈন্য সামন্ত। আর সবার ওপরে রয়েছে নিয়মের কঠোর নাগপাশ, অনুশাসনের অজস্র তালিকা। সেই নিয়মশাসন অথবা প্রথা-সংস্কারজালে চাপা পড়ে গেছে তাসের দেশের মানুষগুলির চিন্তাশক্তি। ব্যক্তিমনের ইচ্ছে অনিচ্ছের চেতনাই তাদের হারিয়ে গেছে। এই জড়পিণ্ডবৎ প্রাণীকুলকে জাগাবার জন্য ইচ্ছেমন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে ভিন্‌দেশি রাজপুত্র।

"তাসের দেশ" বাংলা ১৯৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয় -সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল —

প্রথম অভিনয় — ম্যাডান থিয়েটার, ২৭ শে, ২৮ শে ও ৩০ শে ভাদ্র ১৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনাপ্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।"

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশ থেকে]

'তাসের দেশ' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাসচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

মাঘ ১৩৪৫

৩০১.৪.১৩.৩ - সারসংক্ষেপ

'তাসের দেশ' নাটিকার আছে মোট চারটি দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্যটি মূল নাট্যের ভূমিকা বলা যায়। কিন্তু এখানে নাট্যবিসয়ের আসল বক্তব্যও সংকেতিত হয়েছে। দুই বন্ধু রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্র আলাপনরত। রাজপুত্র তার বৈভব এবং নিরাপত্তাবেষ্টিত জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে। একই ছকে তার চব্বিশ ঘন্টার ঘোরাফেরা। তাই সে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের মতো দূরের আকাশের হাতছানিতে ধরা দিতে চায়। অচিন দেশে অজানা নৌযাত্রায় সে ভেসে পড়তে চায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে —

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে —

মরব না আর ব্যর্থ আশায়

সোনার বালুর তীরে।

রাজপুত্রের এই তারকা, নবীনা, ধ্যানের ধন — কোনও স্পষ্ট রূপে মূর্ত নয় তখনও। রাজমাতা তাঁর মর্মস্পর্শী মন নিয়ে বুঝতে পারেন রাজপুত্রের ভাবান্তরের মূল রহস্যটি — "বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিষে তোমার বিতৃষ্ণা। জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, ... বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সহিতে পারবে না সেবার বন্ধন।"

তাই এরপর মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তরঙ্গিত সাগরবক্ষ পাড়ি দিতে অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে রাজপুত্র। শুধু বন্ধু সদাগরপুত্র রইল তার সঙ্গী।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র পৌঁছেছে অন্য এক দেশে। সংলাপ থেকে জানা যায় যে তাদের নৌকো ডুবেছিল মাঝ সমুদ্রে — তারপর তারা অজানা এক দেশের তীর ভূমিতে ভেসে উঠেছে। 'এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল'। সদাগরপুত্র রাজপুত্রের মতো নতুন কিছুর সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে না। কেননা এদেশের লোকজন যতটুকু তার চোখে পড়েছে তা যেন 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন'। সেই মরা দেশে নতুনত্ব কোথায় কীভাবে আবিষ্কৃত হবে তা তার মাথায় আসে না। রাজপুত্র কিন্তু এরই মধ্যে প্রবল উৎসাহ অনুভব করে। সে খুঁজে পায় এক মহতী সম্ভাবনাময় উদ্দেশ্য — যেন এতদিনে প্রত্যাশাপূরণের একটি সুযোগ এসেছে সামনে, কিছু করতে পারার সুযোগ! রাজপুত্রের মন বলে, নতুন দেশের রীতিনীতি তার আসল সত্য নয়, ওপর থেকে চাপানো খোলসবিশেষ। তাই সে বলে — 'আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।' সদাগরপুত্র জীবনের ওপরমহলটুকু দেখে। রাজপুত্র দেখতে পায় আরও গভীর করে। তাই তাসের দেশের আপাত নিষ্প্রাণতার আড়ালে লুকানো প্রাণের উৎসমুখ সে আবিষ্কার করবে, খুলে দিতে পারবে — এমনই তার বিশ্বাস।

এমন সময় তাসের দলকে কুচকাওয়াজ কের আসতে দেখে এরা দুজন মঞ্চের একধারে সরে যায়। কিন্তু ওদের রকম সকম দেখে সদাগরপুত্র হাসি সংবরণ করতে পারে না। ছক্কা আর পঞ্জার নামের তাস-মানুষ তাদের তিরস্কার করে। নিয়মবহির্ভুত যেকোনও অভিব্যক্তিই তাদের কাছে অপরাধমূলক। নিজেদের বংশ পরিচয় দিয়ে তারা জানায় নিয়মের ছকে বাঁধা পথে তাদের চলা — এর বিচ্যুতির কথা এখানে কেউ কখনো ভাবতেও পারে না। তার উত্তরে রাজপুত্র উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে তার

বাঁধনভাঙার উচ্ছ্বাসমুখর সঙ্গীত —

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।

আমরা বেড়া ভাঙি,

আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,

ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,.....

এমন সৃষ্টিছাড়া গান শুনে ছক্কা-পঞ্জা আপত্তি করে। এ কোন্ নিয়মভাঙা খামখেয়ালী মাতন নিয়মশৃঙ্খলিত তাসের দেশকে ব্যতিব্যস্ত করতে এল? এখানে মান্য হবে না কোনও হেলাদোলার স্বাধীনতা! রাজপুত্র তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকৃতি জগতের দিকে। ওই অরণ্য যে ডালপালা মেলে ধরেছে আকাশের দিকে, আছে কি সেখানে কোনো মাপে-বাঁধার আইন? পর্বতের ঝরণা ধারার উচ্ছলিত আবেগ যে বেপরোয়া আনন্দে নির্গলিত হয়ে চলে তাকে বাঁধবে কোন্ অনুশাসন? এই সমস্তই তাসের দলের কাছে অর্থহীন মনে হয়। আসলে অর্থ-নিরর্থকতার সন্ধান করতে পারে যে মন, তার মৌলিক কোনও অস্তিত্ব এরা রাখেনি। নিজেদের অভ্যাসের গণ্ডীর বাইরে তাকানো তাদের ধাতে নেই, ধারণাতেও নেই।

মঞ্চে এর পরে আসেন রাজাসাহেব, রাণীবিধি। তাদের জাতীয় সংগীত যথেষ্ট কৌতুক উদ্দীপক —

চিড়েতন, হরতন, ইস্কাবন —
অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন। .....
নাহি কথা কহে কিছু
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা
নাই কোনো উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন।

রাজার সম্মানে বিদেশি রাজপুত্র রাজপুত্র যে ভেট পেশ করে, তার কথা শুনে সকলে হতবাক। রাজপুত্র বলে এদেশে যা দুর্লভ তাই তার উপঢৌকন — সে হল উৎপাত। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে স্বাধীন মনের ওঠা-পড়া-গতি-বিভঙ্গে যে আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে — রাজপুত্র তাকেই বলে উৎপাত। শুনে ভয় পেয়ে যায় গতে চলা তাসমানুসেরা। মনে করে অভ্যাসের মধ্যে এ কোন্ বিপত্তি এসে তাদের অজানার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল! রাজপুত্র এই অবকাশে তাসরাজকুমারীদের কাছে তার প্রাণবন্ত আবেদন রাখে — 'চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লল করি।' এমন অদ্ভুত কথা শুনে রাজা দ্বিধাগ্রস্থ হন। কিন্তু রাজপুত্রের নির্বাসনদণ্ডে (রাণীর)

আপত্তি। বাধ্যতামূলক আইন জারির বিরোধিতা করে টেক্কা সুন্দরীরা সমস্বরে অবাধ্যতামূলক বে-আইন দাবি করে। একটা গোলমাল বেধে যাওয়ায় রাজা সভা ভেঙে দেন।

এই যে রাণী এবং রাজকুমারীদের বিচলিত হওয়া, বাধ্যতার অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পাওয়া — এ যেন পুতুলের মধ্যে প্রাণে প্রথম সঞ্চার। শুধু তাই নয়, রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র দেখতে পেল এক অভাবিত দৃশ্য — ইস্কাবনের নহ্লা একলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আকাশ থেকে অন্তরের মধ্যে শুনছে

বুঝি বা চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ! এ কীসের ইঙ্গিত? তাদের খোলসের অন্তরমহলে লেগেচে মানবীয় অনুভূতির পরশমণি! রাজপুত্র আশান্বিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় দৃশ্যটিতে স্থান পেয়েছে ইস্কাবনী, টেক্কানী ও চিঁড়েতনীর মতো শুধুই তাসরমণীরা। সবচেয়ে ছোট এই দৃশ্যে নারীচিত্তে জেগে ওঠা প্রথম আত্মবোধ যার সঙ্গে আছে কিছুটা প্রেমচেতনাও। চিঁড়েতনী সাহসিকা। তাসিনীজন্মের পিছুটান ঝেড়ে ফেলে মানবী হবার ইচ্ছে সে মুক্তকণ্ঠে ঘোসণা করে। অন্যদের মনে ইচ্ছে থাকলেও প্রথা ভাঙার সাহস পায় না তারা। সেই বাস্তব মানস অবস্থাটি নাট্যকার চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন। নারীর সহজাত ভঙ্গিমা, তার সংলাপের বৈশিষ্ট্য দৃশ্যটিতে অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছে।

চতুর্থ তথা শেষ দৃশ্যটি সবচেয়ে বৃহৎ, তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে সাজ খসিয়ে ফেলে বিবিসুন্দরীরা নদীর ধারে গাছের তলায়

আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। নতুন করে নিজেদের দিকে ফিরে তাকায়। কেউ খোলা চুল নিয়ে বেণী বাঁধতে বসে, কেউ বা তার পুরুষ সঙ্গীকে ধন্য করে জবা ফুল তুলে আনবার বরাত দিয়ে — সেই ফুলের রসে সে পা রাঙাবে। কোন্ জন্মান্তরের সৌহৃদ্যে গাঁথা সম্পর্কের অনুরাগে রক্তিম হয়ে ওঠে তাদের মন। তারই শক্তিতে তারা বলতে পারে 'সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী'। বলে — 'সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রুকুটি, ভেঙে চুরমার করাতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে?' প্রাণের গভীর থেকে এমন অসহ দিনযাপনের গ্লানি মোচনের ঝংকার ওঠে। এক তাসনারী, হরতনীর কণ্ঠে প্রথম অলসতা, নির্জীবতা, নিরর্থকতার গণ্ডীভাঙার গান উদ্দাম হয়ে জেগে ওঠে। বিপ্লবস্পন্দিত রুইতন অর্থহীন জীবনের বঞ্চনাকে ধিক্কার জানায় — 'ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও'।

এরপর আসে ছক্কা-পঞ্জা। ওপর মহলের হুকুম তামিল করাই ছিল যাদের কাজ, তারাও আর দহ্‌লা পণ্ডিতের বানানো শান্তির পাঠ শুনে চলতে চায় না। হরতনী সেই শান্তির স্বরূপ ধরিয়ে দেয় একটি উপমা দিয়ে — ভেতরে ভেতরে পোকা লেগে ক্ষয়ে যাওয়া গাছের মতো তাদের শান্তি — তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে কেটে ফেললেই মঙ্গল। যে - শান্তির হিমরসের অনুপান রক্তে মিশে তাকে হিমঠাণ্ডা নির্জীব করে তোলে, তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া দরকার। দহলাপণ্ডিত সংকটে পড়ে আর ছক্কা-পঞ্জা হরতনীকে অনুরোধ করে পথ দেখাতে, বন্ধনমুক্তির পথ।

তারপর আসে ইস্কাবনী, টেক্কানী ও দহলানী। তাদের অনেকদিনের অনুভূতি ও বেদনা তারা আর আড়াল করতে পারে না। মানুষের যথার্থ মন, মানুষের আকৃতি নিয়ে স্বাভাবিক প্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তাদের মনে — 'আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুত্তুরের কাছে।' ইস্কাবনীর এই কথা শুনে টেক্কানী বলে — 'আমিও'।

যন্ত্রজীবনের থেকে প্রকৃত মানবজীবনে প্রবেশ করার মানে মানুষের অনুভূতিগুলির প্রবর্তন মেনে নেওয়া। সেখানে সুখ ও আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে দুঃখ ও বেদনা। কিন্তু সেই গভীর অনুভব থেকে উঠে আসা বেদনার কথা তারা আজ এড়িয়ে যেতে চায় না। সেই দুঃখ-অনুভূতির ভেতরে আছে পরম

পাওয়া — যা অকারণ, কিন্তু অনিবার্য — যেন এক নেশার জড়িমা — প্রাণের নিবিড়তার মাঝে তা পরম পাওয়া —

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে —
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে —
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।

এমন করে মনের কথা খুলে বলা, সখীতে সখীতে কানাকানি তাসের দেশের আইনে নিষিদ্ধ। সম্পাদককে আসতে দেখেই সকলে সেখান থেকে প্রস্থান করে। কারণ সংবাদমাধ্যমের প্রতাপ অখণ্ড — বেচাল দেখলে তা ক্ষমা করে না। দেশসুদ্ধ ঢি ঢি ফেলে দেওয়াই তার কর্ম।

রাজাসাহেব তাঁর দলবলসহকারে মঞ্চে প্রবেশ করেন। আসে বিদেশি রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রও রাজপুত্র তার দেশের ছন্দে আবৃত্তি করে এমন কিছু, যা ছক্কা-পঞ্জা বুঝতে হয়তো ঠিক ঠিক পারল না, কিন্তু তাদের 'মন উঠল মেতে'। এই মনমাতানো ব্যাপারটা রাজার ভালো ঠেকল না। তিনি বললেন, 'আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো —

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে;
বলে মোর 'নাহি প্রয়োজন'।

বললেন — শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র — আদেশ করো।

রাজা — তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে - জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ — এ- সব কেন।

রাজপুত্র — রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই - বা কেন।

রাজা — সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র — এ আমানের ইচ্ছে।

রাজা — ইচ্ছে? কী সর্বনাশ! এই তাসের দেখো ইচ্ছে। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বল।

ছক্কা-পঞ্জা — আমরা ওরা কাছে 'ইচ্ছেমন্ত্র' নিয়েছি।

রাজা — কী মন্ত্র।

ছক্কা-পঞ্জা — (গান)

ইচ্ছে।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

সেই তো আঘাত করছে তালায়,

সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়

বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

ইচ্ছা শক্তির এমন জয়গান তাসেরই যখন তাসরাজার সামনে দাঁড়িয়ে গাইছে তখন রাজার বারণ সত্ত্বেও তাতেই যোগ দিচ্ছে চিঁড়েতনী, হরতনী, রুইতন, এমনকি দহলা পণ্ডিত, শেষ পর্যন্ত রাণীবিবিও। এরা সকলে মিলে তাসের দেশের উল্টো ভাবনা আর ভুল চালনার কথা রাজার কাছে স্পষ্ট মেলে ধরল। যেমন — তাসের দেশের ভাসায় শিকলকে বলে অলঙ্কার!

জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি!

হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর!

বোবাকে বলে সাধু!

বোবাকে বলে পণ্ডিত!

মরাকে বলে বাঁচা!

স্বর্গকে বলে অপরাধ!

এমন নিয়মভাঙা কথাবার্তা শুনে রাজা সবাইকে ধমক দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু কেউ তখন আর পুরোনো ও নকল ধ্যান ধারণার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চাইছে না। অগত্যা রাণীকে পর্যন্ত নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত বলে ঘোষণা করলেন। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই রাণীবিবির। প্রজারাও রাণীর সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে যেতে চায়। এমনকি সবচেয়ে গোঁড়া দহলা পণ্ডিতও তার পুঁথিগুলো ভাসিয়ে দিয়ে প্রস্তুত। এই দেখে সেই মানুষদের খোঁজ পড়ল। তারাই তো এদেশে ইচ্ছেমন্ত্রের হোতা হয়ে এসেছে। রাজপুত্র এসে আশ্বাস দিল সকলকে — হ্যাঁ, সবাই তাসের নকল খোলস ছেড়ে আসল মানুষ হয়ে স্বরূপ নিতে পারবে। রাজা স্বয়ং তখন মানুষ হতে ইচ্ছুক। রাণীমার সহায়তায় তিনিও বেড়া ভাঙার শক্তি পেয়ে গেছেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে ভাঙার গান দিয়ে নাটকের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসে। যে - গানটি আসলে ভাঘা নয়, প্রাণশক্তির জলগাথা :

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,

বাঁধ ভেঙে দাও।

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।

শুকনো গাঙে আসুক

জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;

ভাঙনের জয়গান গাও।.....

৩০১.৪.১৩.৪ - মূল থীম বা ভাবসত্য

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীয় শারদ অবকাশের আগে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করত। একবছর এমনই একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আশ্রমিকেরা কবিকে অনুরোধ করেন একটি নতুন কোনও সৃষ্টির জন্য। যাকে আশ্রয় করে একটি সুচারু মঞ্চাভিনয় সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন নজর দিলেন তাঁর বহু পূর্বে লেখা একটি গল্পের দিকে। ১৮৯২ তে তিনি 'একটা আসাঢ়ে গল্প' নামে রূপকথার ধাঁচে যে - গল্পটি লিখেছিলেন, তারই কাঠামোর ওপরে গড়ে তুললেন এক মঞ্চাভিনয়যোগ্য উপস্থাপনা — 'তাসের দেশ'।

আপাতদৃষ্টিতে গল্পটির যে রসাবেদন, তাতে তাকে রূপকথা বলে মনে হয়। এতে আছে রাজা, রাণী, রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, রাজকুমারীরা; আছে সভাসদ, পার্শ্বচর, পরিচারক। রূপকথায় যেমন মধুর ইতিবাচক এবং মিলনান্ত পরিণতি থাকে, এখানেও তেমনটিই ঘটেছে। কিন্তু এরই মধ্যে এএমন রূপকের ব্যবহার রয়েছে, তাতে একটি সমতল গল্পরসপ্রধান রচনার অতিরিক্ত অন্য কিছু পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। সেখান থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লেখক একটি গূঢ় সত্য লুকিয়ে রেখেছেন হাসি ও রঙ্গ-ব্যঙ্গমুখর 'তাসের দেশ' নাটকের গভীরে। সেই সত্যটিই এই নাটকের মূল তত্ত্ব।

তাসের দেশের অধিবাসী নারীপুরুষ সকলকেই তাসের এক একটি মার্কা নিয়ে মঞ্চে নামতে হয়। এই বেশভূসা, তাদের বাঁধা চালে হাত-পা নাড়া থেকে শুরু করে কথনভঙ্গি — সব কিছুর মধ্যে থেকেই এক অনাবিল হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। এসের যেন ভালো-মন্দ, সাদা কালোর ধারণা নেই। নেই মৌলিক চেতনা, অনুভব করবার মতো মনের সজীবতা। সেই পুতুলের দেশে এসে ভিড়েছে রাজপুত্র — অন্য দেশ থেকে প্রাণশক্তির অমেয়তা নিয়ে। তার উষ্ণ হৃদয়বত্তা তাসের দেশকে কীভাবে আপ্লুত করল, প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সেই কৌতূহলোদ্দীপক পর্যায়গুলি দৃশ্যে দৃশ্যে গাঁথা পড়েছে নাচে-গানে-কৌতুকরসে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় যৌবনের প্রাণসঞ্জীবনে জড়বৎ আবেগহীন মানুসের চিৎশক্তির উদ্বোধন স্থান লাভ করেছে। নাটকে অচলায়তন, রথের রশি, ফাল্গুনী বা নবীন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জড় প্রাণ বা নিষ্প্রাণতার রূপটি অদ্ভুতরসের মোড়কে পরিবেশন করাতে হাস্যরস উচ্ছলিত হয়েছে। আবার তার অসারতার দিকটিও এতে সংকেতিত। শেষপর্যন্ত জীবনের স্পর্শে জড়ের সংস্কারমুক্তির বার্তায় নাটকের তত্ত্ব প্রতিসংা। মানবাত্মা ততক্ষণ মুক্ত নয়, যতক্ষণ না সে স্বরূপে প্রকাশ পায়। সনাতন পন্থা যখন তাকে আগ্রাসনের মধ্যে রেখে দেয়, নিয়মের শাসন নিয়েও তখন সে বড়হি করতে থাকে — বিচার করতে পারে না তার ঔচিত্য কতখানি। তাসের দেশের রূপকে লেখক সংস্কারপীড়িত সেই জাতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যারা স্বকীয় ভাবনা-চেতনার জগৎ থেকে নির্বাসিত। তাদের নিরর্থক জীবনযাপন সত্যকে তখনই স্পর্শ করতে পেরেছে, যখন নিয়মের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে তারা আপন স্বাধীন ইচ্ছের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইচ্ছের মর্ম তারা এভাবেই উপলবব্ধি করেছে —

ইচ্ছে
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

তাই জড়ত্ব ঘুচিয়ে ফেলে তাসবংশীয়েরা মানুষ হয়ে উঠেছে। ইচ্ছের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারলেই মুক্তি — মানবজন্মের সার্থকতাও সেখানে।

৩০১.৪.১৩.৫ — আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' নাটকের মূল থিম বা ভাবসত্য লেখো।

৩০১.৪.১৩.৬ — সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোস ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে : অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন : রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৪

গীতিনৃত্যনাট্য

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৪.১৪.১ : তাসের দেশ গীতিনৃত্যনাট্য

৩০১.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৪.১৪.১ - তাসের দেশ গীতিনৃত্যনাট্য

সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত নব্যযুবক রবীন্দ্রনাথ যখন অনেকখানি পাশ্চাত্যদেশীয় সুর ও তালের প্রয়োগে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) সৃষ্টি করলেন, তখনই এক অভিনব কলা আঙ্গিক একজন নবীন স্রষ্টার হাত ধরে বঙ্গভারতীয় অঙ্গনে প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার বহন করে আনল। ত্রিবিধ কলা — গান, নাচ ও নাটক-এর সমন্বয়ে এমন নতুন আঙ্গিক দর্শক মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক

ভূমিকা রচনা করল। এই পর্যায়ে পরপর আরও রচনা ও উপস্থাপনা হতে থাকল — কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, ঋতুরঙ্গ, নবীন ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পর্যায়ে, বিশ্বভারতীর স্থাপনা এবং সেখানে নৃত্যগীতিদির পাঠক্রম প্রচলন ও তার নান্দনিক চর্চা যখন পূর্ণ উদ্যম নিয়ে বয়ে চলেছে, তখন পরিণত বয়সী কবি আরও পরিশীলিত সুচারু ও মননসমৃদ্ধ গীতিনৃত্যনাট্য উপহার দিলেন। এই পর্বের মধ্যে আছে শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামার সঙ্গে 'তাসের দেশ'ও।

তাসের দেশ-এর গানের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতই সুপ্রযুক্ত ও ভাবপ্রকাশে বিশেষ সহায়ক। প্রথম

সূত্রপাতে 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি সমুদ্রযাত্রার অনুসঙ্গ যেমন ধরিয়ে দেয়, তেমনি এর সুর ও দ্রুত তাল বন্ধনমুক্তির আবহ প্রস্তুত করে। রাজপুত্রের মনোভঙ্গিটি ধরা পড়েছে —

আমার মন বলে 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনের বেদন বাজে,
'নাই নাই নাই গো'।
তাই সে সংকল্প করে —

..... বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

তাসের দেশে পৌঁছে যখন তাসের দলকে দেখা গেল, তাদের কাওয়াজে প্রকাশ পেল গানের আড়ষ্ট সুরের সঙ্গে কেঠো পদক্ষেপের কৌতুকনৃত্য :

তোলন নামন, কিম্বা অন্যত্র:
পিছন সামন, নাহি কোনো অস্ত্র,
বাঁয়ে ডাইনে খাকি-রাঙা বস্ত্র।
চাই নে, চাই নে, নাহি লোভ
বোসন ওঠন, নাহি ক্ষোভ .....
ছড়ান গুটন, যথারীতি জানি,
উলটো-পালটা সেইমতে মানি,
ঘূর্ণি চালটা কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,
বাস্ বাস্ বাস্। কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা।

এমন নৃত্যগীতাভিনয়ে এক মুহূর্তেই দর্শকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় — এই জড়পিণ্ডবৎ জীবগুলি 'কিছু নুতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা এক প্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে, তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুৎলাবাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভানা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।' — 'একটা আষাঢ়ে গল্প' লেখার সময় যে বর্ণনা এভাবে স্থান পেয়েছিল, গীতনৃত্যসহযোগে অভিনয়ের মাধ্যমে কত সহজে তা গোচর হতে পেরেছে। আবার সাহিত্যরস হিসেবেও এর মূল্য কমে যায়নি।

রাজপুত্রের কণ্ঠে 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত' এই গান নৃত্যাভিনয় সহযোগে কতো প্রাণস্পর্শী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর একটি গানে রাজপুত্র যখন রাজকুমারীদের কাছে 'চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি' এই আবেদন রাখে, তখন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় যেন 'পাষাণমূরতি সুন্দরী'দের হৃদয়ের হিল্লোল তরঙ্গিত হয়ে তাসের দেশকে মুখরিত করে, ছড়িয়ে যায় আকাশে-বাতাসে। তাদের মনেও যে গত জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর গুঞ্জন তোলে, তার দূরগন্ধবাণীবহ অজানা বেদনার সুর নৃত্যগীতমাধ্যমেই এমন নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে উঠতে পারে দর্শকেরও মনে। তাস-মানুষের নৃত্যের হিল্লোলে আন্দোলিত দেহ-মনকে এতখানি ধরা যেত না, যদি না হরতন গাইত সেই গান, যা রাজপুত্রের দেওয়া মন্ত্র থেকে সে পেয়েছে তার অন্তরপ্রকৃতিতে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে হরতনের গানটি শাশ্বত হয়ে থেকে যায় শ্রোতার মনে —

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।

এইভাবেই একসময় তারা সবাই মিলে নিয়মের প্রতিস্পর্ধিতা করে গেয়ে উঠেছে 'ইচ্ছে'র জয়সূচক গানটি! আর সবশেষে বাঁধনভাঙার যন্মিলিত আহ্বান। তাস বংশের সবাই, ছক্কা-পঞ্জা-গোলাম-পণ্ডিত থেকে রাজা-রাণী পর্যন্ত যে-আহ্বানে প্রাণের মুক্তিতে চিত্তস্ফূর্তির জোয়ারে ভেসে যায় তা নাট্যশেষের এই গানে ছাড়া কীভাবেই বা দর্শককে এমন করে মাতিয়ে দিতে পারতো —

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,

বাঁধ ভেঙে দাও।

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।

গানগুলির সঙ্গে যেমন নৃত্যপরিকল্পনা আছে, তেমনি সংলাপের মধ্যে সেই সম্ভাবনার সংস্থান রাখা হয়েছে। মূলত নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়েই তাসের দেশ রচিত হয়েছে। নাট্যোচিত দৃশ্যপরম্পরা, প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদির সুনির্দিষ্ঠ, সপরিকল্পিত নির্দেশ নাট্যসৃষ্টিটিতে বর্তমান। চারটি দৃশ্যের মধ্যে প্রথম দৃশ্যটি ভূমিকাস্বরূপ। রাজপুত্রের বিদেশযাত্রার পশ্চাতে প্রথানুগত্য থেকে মুকিনত পাবার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী দৃশ্যে তার অজানা এক দেশে অভিসঞ্চার — 'এলেম নতুন দেশে'। রাজপুত্রের ও সদাগরপুত্রের নাট্যব্যাপী সমস্ত তাদের দেশ-পরিক্রমায় একটি কৌতুকরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে — নাট্যকৌতূহল সৃষ্টিতে এর ভূমিকা যথেষ্ট। ছোট ছোট সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্য আবেদন আর নৃত্যচ্ছন্দ যেন পরস্পরের মান ও আকর্ষণকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

বললেন — শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র — আদেশ করো।

রাজা — তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে - জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ — এ- সব কেন।

রাজপুত্র — রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই - বা কেন।

রাজা — সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র — এ আমানের ইচ্ছে।

নাটকীয় চমক যে এই নৃত্যগীতবহুল নাটকে পরিত্যক্ত হয়নি উদ্ধৃতাংশটি তার পরিচয় বহন করছে।

এই ধরণের দৃষ্টান্ত গ্রন্থটির পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে। নাট্যরসসহযোগে গানের কথা ও সুর, নাচের ছন্দ অত্যন্ত সার্থকভাবেই 'তাসের দেশ' এ প্রতিষ্ঠিত করেছে এক চিরন্তন সত্য। 'বাঁধন ছেঁড়া যৌবনাবেগ ও তারুণ্যশক্তি' পারে সমস্তরকম মাপজোকের কুঠুরি থেকে মানুষকে মুক্তির দিকে উজ্জীবিত করতে — এই হল একটি সাহিত্য ও মঞ্চসফল সৃজন 'তাসের দেশ'-এর মূল বাণী।

মঞ্চে অভিনয়কালে তাসবংশীয়দের স্পষ্ট চিহ্নিত করবার জন্য তাদের সাজে বিশিষ্টতা রাখা হতো। তাসের মার্কা দেওয়া পোশাক ও উষ্ণীষের ব্যবহারের পেছনে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-এশীয় দ্বীপভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে বলে মনে হয়। জাপানী মুখোশের কলাবিদ্যা, জাভাদ্বীপের মুখোশনৃত্যের কথা কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে জানা যায়। 'মুখোশ তৈরী যে গুণী করে, সে সেই শ্রেণিপ্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়। নট সেই মুখোশ পরে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই একটা বিশেস মানুষকে কেবল নয়, বিশেষভাবে এক শ্রেণীর মানুষকে'।

সম্ভবত এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশের অভিনেতাদের নৃত্যভঙ্গিমা ও বেশ নির্ধারণের সময় মনে রেখেছিলেন। তাই সমালোচক বলেছেন — '..... বিদ্রুপনৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাসের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সঙ্গীতে এই বিদ্রূপনৃত্যের ভঙ্গি।'

(রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী)

৩০১.৪.১৪.২ — আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গীতিনাট্য কাকে বলে?

২। রবীন্দ্র গীতিনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।

৩০১.৪.১৪.৩ — সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে : অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন : রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৫

ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৪.১৫.১ : ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

৩০১.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৪.১৫.১ - ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

রবীন্দ্রজীবন ও রচনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মন্ত্র ছিল মুক্তির মন্ত্র। সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মানবমুক্তির মহনীয় দীক্ষা রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে বিশ্বের মানুষ লাভ করতে পারে। খুবই আশ্চর্য হই আমরা যখন দেখি, নিতান্ত শিশুকালে মাষ্টারমশাইয়ের দেওয়া একটি লাইনের পাদপূরণ করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বুঝি ব্যক্ত করেছিলেন। 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' — শিশু কবির অনুভবে ধরা পড়েছিল যে সেই কূপবন্দীত্বের হীনতা থেকে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের পথ চেয়ে থাকা — যতক্ষণ না 'বরসা ভরসা দিল আর ভয় নাই'! 'অতিথি'র কিশোর তারাপদকে কোনো বাঁধনেই বাঁধতে পারা যায়নি। নিয়মের পাশ সহজকে কঠিন, প্রবহমানকে 'অচলায়তন' করে ফেলে। তার বিরুদ্ধে মুক্ত চেতন রবীন্দ্রনাথ গল্পে-কবিতায়-গানে-গদ্যে-নাটকে, আজীবন কর্ম সাধনায় মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে এসেছেন। এইজন্যেই তাঁর সৃষ্টি কালান্তরের বাণীবহ, শাশ্বত মূল্যে স্বীকৃত।

'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনার মধ্যে পড়ে। গীতিনৃত্যনাট্যের প্রথম সার্থক রূপকার এই নাট্যসৃষ্টিতে অনেকটাই অভিনব ভাব-ভাবনা-আঙ্গিক নিয়ে এসেছিলেন। গানের সুরের আন্দোলন এ-নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। কথা ও সুরের জাদুতে নতুন দেশের অভিসারী রাজপুত্রের কণ্ঠে জাগে বন্ধনমুক্তির উচ্ছ্বাস — অজানাকে জয় করবার সংকল্প —

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই

যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু। .....
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু
অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায় .....

অকূলের কূলে ভিড়ে সত্যিই এক অদ্ভুত অজানা দেশে এসে পৌঁছোল রাজপুত্র। অভিনবত্ব তার প্রার্থিত। সেই হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন যেন এই তাসের দেশ। কিন্তু এ কী ধরনের বৈচিত্র্য! অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাসের দেশের দলবল প্রবেশ করেছে মঞ্চে। তাদের চলনের ঢং দেখলে সং-এর নৃত্য বলেই মনে হয়। তেমনি তাদের ধ্যানধারণার অবাস্তবতা। তাসবংশের উৎপত্তির ইতিহাস রাজপুত্র-সদাগরপুত্রকে বিস্মিত করে। গোধূলি লগ্নে পিতামহ ভীষ্মের হাই তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারমুখ থেকে চার ধরনের তাসেদের উৎপত্তি হল। তারাই হরতন, রুইতন, চিড়েতন ইস্কাবন। কিন্তু সবচেয়ে যা অদ্ভুত তা এদের ওঠা-বষা, চলা-ফেরা, কথাবার্তায়। একেবারে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা অস্তিত্ব নিয়ে তারা তটস্থ - পাশে কোথাও নিয়মভঙ্গ হয়ে যায়। বাঁধা গতে পথ চলে বলেই তাদের পথ আর এগোয় না। জালে বন্দী তাসেরা বুঝতেও পারে না তাদের জীবনের বঞ্চনার কথা। উপরন্তু এইসব অবোধেরা এই নিয়েই বড়াই করে থাকে।

রাজপুত্র এই নাট্যে বাঁধনভাঙার মন্ত্র নিয়ে এসেছে। যৌবনের জয়গান করতে গিয়ে সে গেয়েছে 'আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত'। নৃত্যের চপল লীলায় এর স্পন্দন নিশ্চয়ই তাসেদের মধ্যে কমবেশি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই যাদের বৈশিষ্ট্য ছিল—

বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোন উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন।

তাদের কণ্ঠেও এমন উত্তাল সঙ্গীত; তাদের মনও হয়ে পড়ল আবেগে উতলা —

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে।

গানের সুরে আর নাচের ঝংকারে এই জন্মের বেড়ি তো ঘুচে গেলই, তারা পূর্বজন্মের অচেনা গণ্ডীও ছাড়িয়ে গেল।

কেননা তাদের চিত্তশীলের বিস্ফার ঘটেছে। হরতনী রুইতনকে বলে, 'মনে কি আসছে....., তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো একটা যুগে।' দ্বিতীয় দৃশ্যে যেকথা রাজপুত্র বলেছিল সদাগর পুত্রকে — 'আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব'। সেই কথাই চতুর্থ-দৃশ্যে ফুটে উঠেছে হরতনীর হৃদয়মূলে — 'কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। একি অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার

আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।' স্বজাতির মধ্যে আজন্মকাল যে অনুবর্তন দেখে আসছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে হরতনী। নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সে — এমন নব প্রেরণা জাগাতে রাজপুত্রের আনা ইচ্ছেমন্ত্রই কাজ করেছে চাবিকাঠির মতো। প্রাণের আলোর দ্যুতি ঠিকরে উঠেছে রাজপুত্রের নৃত্যগীতচ্ছন্দের দোলায় —

ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে।

সমুদ্রপারের ছন্দ মাতিয়ে দিয়েছে তাসের দলের মন। সনাতন শাস্ত্রের ছন্দে মরে থাকার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য উচাটন তাদের অন্তর। নিয়ম ভাঙার মধ্যে দিয়ে ইচ্ছের প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্বরে রাজার কাছে দাবি করেছে তারা। রাজার বিস্ময় বর্ধিত করে ইচ্ছেমন্ত্রের জয়গান করেছে ছক্কা-পঞ্জা :

ইচ্ছে
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।।

এমনি করে জীবন্ত নির্জীবতার দৃষ্টান্ত তাসের দেশের জীবগুলির মধ্যে চেতনা জেগেছে। ক্রমে ক্রমে তারা বুঝল যে ইচ্ছে কি। দেখতে লাগল এমনি করেই শুধু না চলে অমনি করেও চলা সম্ভব। বিদেশ থেকে যে দুটি মানুষ এসেছে, তারা বুঝিয়ে দিয়েছে 'বিধানেই মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটি রাজশক্তির প্রভাব' অনুভব করল। তাদের রাজার চেয়েও যে এই ইচ্ছেরাজের শক্তি বেশি, তা প্রমাণ হয়ে গেল। টেক্কা-সাহেব গোলামরা যেমন এতদিনের নিয়ম অমান্য করেছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ, ঈর্ষা, হাসি-কান্না সংশয়-ব্যাকুলতার ণেউ-এর ওঠাপড়া শুরু হয়েছে, বিবিসুন্দরী ও রাণীবিবির মধ্যেও তেমন ভাবের উদ্বেল আলোড়ন! রাজা স্বয়ং আর নিজেকে আলাদা করে বিয়মবিধানে বদ্ধ রাখতে পারলেন না।' একটা আষাঢ়ে গল্পে'র উপসংহারে পরিবর্তনের সেই সুরটি সুন্দরভাবে ধরা আছে — "ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাম্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেস বিপদসম্পদ হইয়া ..... নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ — এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু ও অসাধু"।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অপর নাম ইচ্ছাস্বাধীনতা। তাসের খোলস হল বিধানের খোলস। সেই মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই তাদের আসল মুখ বেরিয়ে পড়ল। হয়ে উঠল তারা প্রাণশক্তি সম্পন্ন ইচ্ছেবান প্রকৃত মানুষ পদবাচ্য।

৩০১.৪.১৫.২ - আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' নাটকে ইচ্ছামন্ত্র বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২। 'ভাঙতে হবে অলসতার বেড়া, নির্জীবের গণ্ডী, নিরর্থকের আবর্জনা' — এই উক্তি কার? উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো।

৩০১.৪.১৫.৩ - সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোস ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে : অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন : রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৬

তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৪.১৬.১ : তাসনারীদের ভূমিকা

৩০১.৪.১৬.২ : রাজপুত্রের ভূমিকা

৩০১.৪.১৬.৩ : উৎসর্গপত্র

৩০১.৪.১৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.৪.১৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৪.১৬.১ - তাসনারীদের ভূমিকা

রূপক তত্ত্বনাট্য 'তাসের দেশ-এর রাজা-প্রজা সকলেই তাসবিশেষ। হরতন, রুইতন, চিঁড়েতন ও ইস্কাবন এই চার শ্রেণির মধ্যে বিভক্ত হয়ে নিয়মসিদ্ধ তাসবংশীয়েরা জীবন অতিবাহিত করছে। তাদের মধ্যে যারা স্ত্রী-জাতীয়, তারা আখ্যাত হয়েছে এইভাবে — টেক্কানী, দহলানী, ইস্কাবনী, হরতনী এবং সর্বোপরি বিবিরাণী বা রাণীবিবি।

'তাসের দেশ' গীতিনৃত্যনাট্যে লেখক যে পটভূমি গ্রহণ করেছেন, তা একটি দ্বীপে অবস্থিত। মানব সংসার থেকে বহুদূর তাসের দেশে এসে পড়েছে দুই যুবক — রাজপুত্র আর তার বন্ধু সদাগর পুত্র। এদের, বিশেষত রাজপুত্রের প্রাণের আবেগ ক্রমে তাসের দলের নিষ্প্রাণ জড়ত্বে ফাটল ধরাল এবং শেষপর্যন্ত যে দেশের ইমোশন বর্জিত নির্মনস্ক মানুষগুলি প্রকৃত মানুষের প্রাণচেতনায় সঞ্জীবিত হতে পারল। এই যে ভাবান্তর এবং রূপান্তর — রবীন্দ্রনাথ নাতিবৃহৎ নাট্য রচনায় রূপকের আশ্রয়ে তার ধারাবাহিক বিশ্বাস্যতামুখী পরিচয় রেখেছেন। এ প্রসেঙ্গে প্রকৃতির ভূমিকার কথা এসে পড়ে। মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনবচ্ছেদী সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। তাসের দেশে রাজপুত্র দেখেছিল মানব প্রকৃতি বা মানুষের স্বাভাবিক অনুপ্রাণনার একান্ত অভাব। তখন যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রকৃতিজগতের দিকে —

হেরো অরণ্য ওই
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরণাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে।

রাজপুত্রের কথায় প্রথমে তাসপুরুষেরা কর্ণপাত না করলেও রাজপুত্র হাল ছাড়েনি। তার আবেদন যে যথার্থভাবেই রেখে দিয়েছে রাজকুমারীদের কাছে। সকরুণ বেদনার অনুভূতিতে তাদের সাশ্রুনয়নে কুঞ্জবনের

নিভৃত আহ্বান রাজপুত্রের কণ্ঠে বেজে উঠেছে। আসলে সমস্ত পিণ্ডবৎ, পাষাণবৎ তাসজনতার মধ্যে সুন্দরীকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যিই সহজ হয়েছে, সফল হয়েছে। কেননা তারা তো বিশ্বপ্রকৃতির সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। নিয়মবাধ্যতার বিরুদ্ধে টেক্কা কুমারীরা একথা বলতে ভয় পায়নি যে 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন!' তাই দেখা যায় হরতনীর নিত্য নিয়মের ভুল হয়ে যাওয়া। চতুর্থ দৃশ্যের শুরুতে শোনা যায় হরতনীর কণ্ঠে গান — 'আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে.....' পূর্ব পরিচয়ের রেখা পেরিয়ে সে অতলান্ত মনের মধ্যে অসীমের কল্লোল শুনতে পায়। তার চরণছন্দে লাগে অনিয়মের নাচের আনন্দজোয়ার। মেয়েরা সকলেই বনপথে, ঝরণাতলার নির্জনে একলা মনের দোসরের সংকেত পায়। তারা চুল বাঁধতে চায় সুন্দর করে। তাদের পদতল রাঙাবার জন্য আর জলভরবার ঘট চিত্রিত করবার জন্য অনুভবী সঙ্গীও পায়। হরতনীর উদ্দেশ্যে রুইতন গেয়ে ওঠে —

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনে বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমার ভূসণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।

প্রাণের অনুরাগ মনুষ্যমহিমায় শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তাসনারীর দীক্ষাই তাসপুরুষের বক্ষে অনুরাগের অনাসাবাদিত স্পন্দন জাগিয়েছে। চিঁড়েতনী, ইস্কাবনী, টেক্কানীকে নিয়ে নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি জমে উঠেছে। সকলেরই মনে 'ইচ্ছে' জেগে উঠেছে। সকলেরই হাবে ভাবে গোপন রাখা যাচ্ছে না তাসিনীর সাজ খসিয়ে দিয়ে মানবী হবার বাসনা। "নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি আরতি-উচ্ছ্বাষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ...

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে — আজ সহসা দক্ষিণ বায়ু চঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গ রাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গিতে ভাসাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।" — 'একটা আষাঢ়ে গল্প' থেকে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রকৃতিরূপিণী নারীর একাত্ম উদ্বোধন অত্যন্ত শিল্প সম্মতভাবে করা হয়েছে। বর্তমান নাট্যে বিষয়টি তাসনারীদের সংলাপ এবং গানের মধ্যে অভিব্যক্তি। বিশেষত হরতনীর কণ্ঠে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণ্‌গুণিয়ে' গানটি, বিবিসুন্দরীদের নৃত্যসহযোগে গাওয়া

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে। .....
কোন্ বসন্তের মিলন রাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।

— প্রকৃতির সঙ্গে নারীমনের গভীর যোগ আভাসিত করে। তারই ছোঁয়া পেয়ে মনের বেড়ি ঘুচিয়ে দেয় পুরুষেরা। চাঞ্চল্যের টানে, যৌবনের বন্যায় ভেসে যাবার আনন্দসন্ধান তারা তো তাসনারীদের কাছ থেকেই

পেয়েছে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে যখন রাজার নিয়ম প্রত্যাখ্যান করে, তাসের দেশের বেড়াজাল থেকে নির্বাসনদণ্ড যেচে গ্রহণ করতে চায়, তখন রাজাও যেই বেড়িভাঙা পথের যাত্রী হবার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন — 'ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব?' রাজপুত্র রহস্য করে বলে — 'সন্দেহ করি। কিন্তু রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রাণীর।' অর্থাৎ নব জাগৃতির আসল কাণ্ডারী নারী। নারীর এক রূপ রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মধ্যে। হ্লাদিনী শক্তির অনুরূপ প্রকাশ না হলেও তাসের দেশের তাসনারীরাও যে মুক্তিপথের দিশারী হয়ে এই নাটকে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। নিজেদের মুখাশ সরিয়ে দিয়ে মানবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে তারাই তাস পুরুষদের স্বরূপে আত্মস্থ হবার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিরূপিণী নারীর ভূমিকা সীমাবেষ্টিত তাসের দেশকে দিয়েছে অপরিসীমের বিস্তার।

৩০১.৪.১৬.২ - রাজপুত্রের ভূমিকা

'তাসের দেশ' নামে কাল্পনিক একটি দ্বীপ 'তাসের দেশ' নামে নাট্য রচনার স্থানিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু নাটকের মূল কেন্দ্র যার তৎপরতায়, কটি তত্ত্ব তথা বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে ভিন্‌দেশি রাজপুত্র। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' যখন লেখা হয়েছিল, তখন রাজপুত্র ছিল দুয়োরাণীর পুত্র। নির্বাসিত মা'র সঙ্গে সে একলা সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করে। তার অভিলাস ও কল্পনার জাল দিগ্‌দিগন্তরে প্রধাবিত হয়। "তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ওই দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে — খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।"

উদ্ধৃত অংশটিতে সম্পূর্ণভাবেই রূপকথার আবহ ও আয়োজন। রাজপুত্রের মধ্যে অজানাকে জয় করবার প্রেরণা এক থাকলেও নাটকে তার আবহ একটু বদলে গেছে। এখানে দুয়োরাণীর পুত্র নয় সে। প্রচুর বিলাষ বৈভব, বন্দনাগান ও নিরাপত্তার মাঝখানে হাঁপিয়ে উঠে বৈচিত্র্যপিপাসু রাজপুত্র পাড়ি দিয়েছে 'সুবুদ্ধি ঘেরা জগতের' পরিকাঠামোর বাইরে। অভাবের অভাব থেকে সে গেয়ে উঠেছে —

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে,
'নাই, নাই, নাই গো।'

তাসের দেশ নাটকের রাজপুত্র তার বন্ধু সদাগরপুত্রকে নিয়ে ভিখারী মনকে রাজার সম্পদে পূর্ণ করে ফিরে আসবে বলে সমুদ্রযাত্রায় বেরোয়। নৌকোডুবি হয়ে তারা অচেনা এক দেশের সমুদ্রতীরে ভেসে ওঠে। সেটাই 'তাসের দেশ'। কেননা সেখানকার মানুষজনের নিজস্ব কোনো ভাব নেই — তাই ভাবের পরিবর্তনও নেই। চিরকাল তাদের একটাই ভাব যেন তাসের গায়ের ছাপের মতো তাদের ওপরে সেঁটে রয়েছে। অসামান্য শৃঙ্খলাপরায়ণ এই প্রাণীগুলির মধ্যে কোনো আশা, অভিলাস, হাসি, কান্না, সন্দেহ, নতুন পথে চলবার কোন চেষ্টা নেই। নেই চিন্তা বা বিবেচনা করবার ক্ষেত্র। তারা শুধু পূর্ববর্তীর অনুগমন করে যায় — দাগা বুলোবার মতো করে।

এদের দেখেশুনে রাজপুত্র বুঝতে পারে নিয়মিত জীবনচর্যার নিশ্চিত নিরাপত্তাই এদের জীবনকে নির্জীব নিষ্প্রাণ করে রেখে দিয়েছে 'ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে'। যে একঘেয়ে নিশ্চিন্ততা রাজপুত্রকে সমুদ্রযাত্রায় উদ্বেলিত করেছিল, তাসের দেশবাসীর জীবনাচরণে তারই আরও দৃষ্টান্ত রাজপুত্রকে অন্য এক লক্ষ্যে নিয়ে গেছে। বন্ধুকে তাই সে বুঝিয়েছে — "জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে"।

রাজপুত্রের ব্রত হল তাসের খোলস ঘোচানো। সাধারণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে ছক্কা-পঞ্জা-দহলা পণ্ডিত কাউকেই তাসের বেশ ভূষা কিম্বা অস্তিত্বের অসারতার কথা গোচর করাতে পারল না। তখন রাজপুত্র সে দেশের রাজার অনুমতি নিয়ে রাজকুমারীদের কাছে হৃদয়বোধ জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। কষ্টিপাথরে যেমন সোনার দাগ ধরে, তেমনি অনুভববেদ্য নারীর চিত্তলোকে রাজপুত্রের হৃদয়সংবাহী আবেদন অনুভূতির তরঙ্গ তুলেছে। সব আইন-কানুন, হিসেব নিকেশ জলাঞ্জলি দিয়ে তাসসুন্দরীরা স্বভাবসৌন্দর্য্যের জগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। শুধু তাই নয়। তাদের দেখে এতদিনের ঠলি-পরা চোখ দিয়ে দেখা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুক্তির প্রশস্ত দিগন্তে তাকিয়েছে পুরুষকুলও। হরতনীর উদ্দেশ্যে রুইতনের গান তাসজন্মস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার গান —

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূসণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁধে দিই তোমার অনুরাগে।

এমন রাগ-অনুরাগে যেমন অভিসিঞ্চিত হয়েছে নারীপুরুষের অন্তর, তেমনই মিথ্যে জীবন টেনে চলা থেকে অব্যাহতি পাবার তাগিদে তারা বলে উঠেছে — "ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গন্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।" যৌবনের প্রতীক রাজপুত্র তাসেদের মুক্তিমন্ত্রদাতা। তারই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে তাসবংশ প্রাণের জোয়ারে মুছে দিতে প্রস্তুত হয়েছে জীর্ণ পুরাতনকে।

এরই সূত্রে তাসজাগরণের বাণীবহ ইচ্ছেমন্ত্রের জয়ধ্বনি শোনা গেছে। রাজার নিয়মতন্ত্রকে স্পর্ধার সঙ্গে যে-মুহূর্তে রাজপুত্র নস্যাৎ করেছে তখনই দলের সর্বস্তর থেকে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফুর্ত আত্মঘোষণা নিস্যন্দিত হয়েছে। ইচ্ছের জয় ঘোষণা তো আসলে আত্মশক্তি উদ্বোধনেরই ঘোষণা। সর্বপ্রকার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসাতে সামিল হয়েছে তাসের দেশের আপাময় জনতা — রাজা-রাণী সকলেই।

যৌবনের দূত হয়ে রাজপুত্র এসেছিল তাসের দেশে। সেখানকার শান্তভাব ও শান্তির আবরণ ঘুণ ধরা পোকা-খাওয়া গাছের মত। চঞ্চলতার দোলা লাগিয়ে সেই ভেতরে ভেতরে পোকা লাগা নির্জীব গাছটার মতো তাসের দেশের আপাত শান্তিরক্ষক নিয়মের ভূতকে সমূলে উপড়ে দিল রাজপুত্র।

রাজপুত্রের গানগুলি, সংলাপগুলি প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে প্রকাশ করলে তার সার্থকতা বহুগুণিত হয়। মঞ্চে

উপস্থাপনার যোগ্য করে রচনাটি সৃষ্টি হয়েছিল। পাঠক হিসেবে রসগ্রহণে তাই কিছুটা সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিতে হয়। আর একটি কথাও উল্লেখ্য। 'একটা আষাঢ়ে গল্পে'র রাজপুত্র স্বয়ং হরতনের বিবির বরমাল্য

লাভ করেছে। 'তাসের দেশ' — এ কিন্তু রাজপুত্রকে নাট্যকার এরকম কোনো সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট করেননি। প্রাণের বন্যায় তাসের দেশকে প্লাবিত করেই তার ভূমিকা সার্থক হয়েছে। 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্র তাই চিরচঞ্চল, চিরযৌবনের প্রতীক, নিত্য সম্পর্ক বন্ধনের অতীত।

৩০১.৪.১৬.৩ - উৎসর্গপত্র

'তাসের দেশ' নাটিকাটি উৎসর্গিত হয়েছে ভারতের গৌরব ত্যাগব্রতী দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে। (প্রেক্ষাপট অংশে 'উৎসর্গ' অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে।) দেশের মানুষকে তাদের প্রাপ্য থেকে মিথ্যার ঘেরাটোপ পরিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা, দেশের সম্পদ এবং প্রাণপ্রেরণার সুফল গ্রহণ করার স্বার্থপূর্ণ হীনতা পৃথিবীর নানা দেশের মত ভারতবর্ষেও ঘটে চলেছিল। ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকাল ধরে কুসংস্কারের অনুবর্তন এবং স্বার্থপুষ্ট শ্রেণিশত্রুদের সুপরিকল্পিত শোষণ চলেছিল। তার ফলে দেশবাসীর নিরুচ্চার দুর্ভোগ রবীন্দ্রনাথ আপন মর্মে অনুভব করেছিলেন। সমসাময়িকভাবে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়বত্তা এবং কর্মসাধনা দিয়ে এই দুরপনেয় অন্যায় ও বাধা দূর হওয়া সম্ভব, এমন বিশ্বাস হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। 'মানুষকে রাষ্ট্রক্রীড়ার ঘুঁটিরূপে জনপিণ্ডে পরিণত করার চেষ্টা'র প্রতিস্পর্ধী যে সাহসী সুভাষচন্দ্রের কর্ম-প্রেরণার মধ্যে রূপ পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেই স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে নাটিকাটি উৎসর্গ করে। রাজপুত্রের ভাবাবেগ, মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদানের দৃপ্ত শক্তি যেমন, তেমনই কর্মোদ্যোগে সাফল্যের জয়ধ্বনি আমানের শাশ্বতকালের নেতার উদ্দেশ্যেও জ্ঞাপিত হয়েছে।

৩০১.৪.১৬.৪ - আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' রচনাটিকে সাহিত্যের কোন্ শাখার পর্যাভুক্ত করা যায়? তোমার অভিমতের সপক্ষে যুক্ত দেখাও।

২। তত্ত্বনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।

৩। রবীন্দ্র গীতিনৃত্যনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।

৪। 'তাসের দেশ' নাটকে ইচ্ছামন্ত্র-বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

৫। 'ভাঙতে হবে অলসতার বেড়া, নির্জীবের গণ্ডী, নিরর্থকের আবর্জনা' — এই উক্তি কার? উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো।

৬। 'তাসের দেশ'-এর মুক্তিতে তাস নারীরা কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করো।

৭। প্রকৃতি ও নারী — এই দুয়ের সঙ্গে রাজপুত্র কীভাবে তাসের দেশ প্রাণের জোয়ার এনেছিল তা বর্ণনা করো।

৮। যৌবনের চঞ্চলতা ও প্রাণশক্তির প্রতীক 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্র। — মন্তব্যটি বিশদ করো।

৯। 'তাসের দেশ' নাটিকার ব্যবহৃত গানের গুরুত্ব কোথায় তা পর্যালোচনা করো।

১০। 'তাসের দেশ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। — এস নিবেদনের যাথার্থ্য কোথায় তা আলোচনা করো।

৩০১.৪.১৬.৫ - সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে : অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন : রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

NOTES